<u>একা নায়ক - ভালো একনায়কের সন্ধানে</u>

মৈত্রীশ ঘটক ও অমিতাভ গুপ্ত

১

দেশের হাল যে খারাপ তা বোঝার জন্য শুধু অবসরপ্রাপ্তদের বিলাপমুখর আড্ডায় বসার দরকার নেই। কাগজ খুললে ধর্ষণ আর খুন নিয়ে শিরোনামেরা প্রতি দিন জল্লাদের মত হিংস্র উল্লাসে চিৎকার করে, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে মধ্যবিত্তের সোচ্চার বিলাপে ঢাকা পড়ে যায় দরিদ্র মানুষের স্তম্ভিত বিপন্নতা, টাকা আত্মঘাতী ঝাঁপ দিয়েছে অতলে, দেশের অর্থনীতির না আছে অর্থ, না আছে কোনও নীতি, আর রাজনীতি আর দুর্নীতি সমার্থক শব্দ হয়ে উঠেছে। গোটা দেশে চল্লিশ কোটি মানুষ এখনও দিনে তিরিশ টাকার কমে বেঁচে থাকে, এটা ভাবলেই শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে যেতে বাধ্য। স্বাস্থ্যের খবরও এক রকম। আমাদের রাজ্যেই পাঁচ বছরের নীচে যত শিশু রয়েছে, তার প্রায় অর্ধেক রক্তাল্পতায় ভোগে। সরকারি স্কুলের মাস্টারমশাইরা ক্লাস না করিয়ে প্রাইভেট টিউশন খুলে বসেন, স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তারবাবু মাসে এক দিন আসার সময় পান না, মিড ডে মিলের চাল-ডাল-জ্বালানি চলে যায় সহায়িকার বাড়িতে, পুলিশ শিষ্টের দমন ও দুষ্টের পালনে নিবেদিত, মন্ত্রী বদলে দেন সিবিআই-এর রিপোর্ট, সুদীপ্ত সেন বাজার থেকে কুড়ি হাজার কোটি টাকা তুলে ফেলেন স্রেফ লোভ দেখিয়ে, দিনের আলোতেও রাস্তায় বেরোতে ভয় পান মহিলারা, টমেটোচাষিদের বস্তা বস্তা ফসল রাস্তায় ফেলে দিতে হয় বাজারে দাম না পেয়ে এবং এ রকম আরও হাজারটা ঘটনা যখন প্রতিনিয়ত চোখের সামনে ঘটতে থাকে, তখন স্পষ্টতই বোঝা যায়, দেশটা চলছে না। এ ভাবে হয় না।

এই মারাত্মক অবস্থা থেকে দেশটাকে ফিরিয়ে আনবে কে? এই একটা প্রশ্নের উত্তর গোটা দুনিয়া খুঁজে বেড়াচ্ছে, আজ নয়, বহু দিন ধরে। সময়বিশেষে সবাই ঘুরে ফিরে একটা সমাধানে পৌঁছেছে – এমন এক জন নেতাকে, এমন এক জন মানুষকে ক্ষমতার শীর্ষে চাই, যিনি অসীম শক্তিধর হবেন। যিনি আর কারও ওপর নির্ভর ক রবেন না, নিজেই ঠিক করে দেবেন যেখানে যা অনাচার আছে, তার সবটুকু। তিনি সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান এবং সর্বত্র বিরাজমান। অর্থাৎ, সুপারম্যান। এই নামের মার্কিন কমিক স্ট্রিপটির বয়েস এখন ঠিক ৮০ বছর। ১৯৩৩ সালে প্রথম বেরিয়েছিল। খেয়াল করে দেখুন, সুপারম্যানের জন্মমুহূর্তটি কিন্তু অনেক বেশি পরিচিত একটা অন্য কারণে, ১৯৩০-এর মহামন্দার দাউ-দাউ জ্বলতে থাকা সময় হিসেবে। সুপারম্যানের চরিত্র যখন ভেঙেগড়ে তৈরি হচ্ছে, তখন এক দিকে জার্মানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভগ্নস্তূপ থেকে উঠে দাঁড়াবার জন্যে সব আশা-ভরসা সঁপেছে হিটলার নামের এক বলিষ্ঠ নেতার হাতে। এফ ডি আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বলছেন, ঘুরে দাঁড়ানো ‘নিউ ডিল’-এর মাধ্যমেই সম্ভব। সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে তাকিয়ে আছেন সারা বিশ্বের প্রগতিশীল মানুষেরা, জোসেফ স্তালিন নামের এক নির্ভীক নেতার নেতৃত্বে নতুন সভ্যতার সূচনা হচ্ছে। সেই ইতিহাসে আপাতত ঢোকার দরকার নেই। শুধু এটুকু মনে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে মহামন্দার মতো সংকট অন্তত

ধনতান্ত্রিক দুনিয়া তার আগে দেখেনি, এমনকী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েও নয়। আমরা বলতেই পারি, এই সংকট থেকে বেরোনোর আকুলতা থেকেই জন্ম হয়েছিল আধুনিক সময়ের প্রথম সুপারহিরোর। মার্কিন কমিক স্ট্রিপে, আবার সত্যিকারের রাজনীতির ময়দানেও।

ত্রিশের দশকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সত্তরের ভারতে চলে এলে আরও এক রূপকথার জন্ম দেখতে পাব আমরা। তাঁর নাম অমিতাভ বচ্চন। হিন্দি সিনেমার প্রথম সুপারহিরো। সুপারম্যানের মতো অতখানি নন, নিঃসন্দেহে – কারণ তাঁর পা রাখার জন্য কল্পবিজ্ঞানের জমি ছিল না। কিন্তু গল্পটা আসলে এক। তিনি একা সায়েস্তা করে দেবেন সব মন্দ লোককে। সময়টাও একই রকম। ভারত তখন নেহরু যুগ পেরিয়ে পা রাখছে দুর্নীতির পাঁকে , দেশটা যা হবে বলে মানুষ সাতচল্লিশে স্বপ্ন দেখেছিলেন, আসল ভারত সরে গিয়েছে তার থেকে বহু দূরের এক চোরাগলি তে। সেই সময়ের সম্মিলিত হতাশার মাটিতেই অমিতাভ বচ্চনের ‘জন্ম’। রুপোলি পর্দায় তাঁকে দেখে, অন্তত সিনেমাহলের ভিতরে থাকা তিন ঘণ্টায়, আমরা আশ্বস্ত হব যে আমি না পারলেও আর এক জন আছেন, যিনি সব ঠিক করে দিতে পারেন।

এখানে আর একটা কথা বলে রাখা যাক– অন্ধকারতম সময়েই কিন্তু সুপারহিরোর প্রয়োজন পড়ে। ভারতের অভিজ্ঞতাও সে কথাই বলছে। ১৯৫০-এর দশকে, নেহরু-যুগের সমাজতন্ত্র যখন পুরোদমে চলছিল, দেশে একটা আশাবাদের হাওয়া বইত, তখন কিন্তু বম্বের সিনেমায় অবিসংবাদী নায়ক ছিলেন রাজ কাপুর – তাঁর সুখী, ভালমানুষ ভবঘুরে ভাবমূর্তি নিয়ে। তখনও সমাজের মধ্যে যেহেতু সুদিন আসার বিশ্বাস ছিল, অন্তত সর্বব্যাপী অনিয়মের চাপে দমবন্ধ হয়ে আসত না প্রতিনিয়ত, তাই রুপোলি পর্দায় মসিহার দরকার হয়নি। সমাজ থেকে বিশ্বাসের বিদায় আর রাজ কাপুরকে পেরিয়ে রাগী যুবক অমিতাভ বচ্চনের পর্দার দখল নেওয়া সময়ের হিসেবে একে অপরের পিঠোপিঠি । দমবন্ধ হয়ে এলেই মানুষ সুপারহিরো খোঁজে।

কিন্তু গল্প-কমিক স্ট্রিপ-সিনেমার সুপারহিরোরা, আমরা হাজার চাইলেও, মাটিতে নেমে আসতে পারবেন না। মুশকিল হল, সমস্যাগুলো এই মাটিরই, ফলে তার সমাধান করতে হলেও রক্ত-মাংসের মানুষ চাই। সেই মানুষ পাওয়া যাবে কোথায়? যাঁরা পেশাগত ভাবেই সমাজের কাজ করেন, অথবা সেই কাজ করার কথা বলেন, আমরা তাঁদের মধ্যেই এই সুপারহিরোর খোঁজ করি। অর্থাৎ, রাজনৈতিক নেতা। উঁহু, রাজনীতিক শুনে নাক কোঁচকানোর আগে ভাবুন তো, বাঙালিদের সর্বকালের সব চেয়ে জনপ্রিয় নায়ক কে? নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কিন্তু রাজনীতিকই ছিলেন। বর্তমানের দিকে চোখ ফেরালে ২০১১ সালের মে মাসের আগে পর্যন্ত কত জন ভাবছিলেন, রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতবদল হলেই পশ্চিমবঙ্গের ছবিটা বদলে যাবে? একা হাতে বদলে দেবেন সেই এক জন? তিনিও কিন্তু আপাদমস্তক রাজনীতিক। এই নায়কেরা সবসময় দেশের নাও হতে পারেন। সত্তরের দশকে অনেকে ভেবেছিলেন, চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। বর্তমান অ্যামেরিকার রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে অনেকেই ভেবেছিলেন অ্যামেরিকার আন্তর্জাতিক আইনকানুনের পরোয়া না করে স্বাধীনতা রক্ষা করতে দমন পীড়ন এবং শান্তি বজায় রাখতে যুদ্ধ এই ধরণের অরওয়েলীয় নীতির দিন শেষ, এখন তাঁরা শুনতে পাচ্ছেন সিরিয়া-তে বোমাবর্ষণে উদ্যত যুদ্ধবিমানের এঞ্জিনের আওয়াজ। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে অনেককে হাতছানি দিচ্ছে নিরামিষাশী নরেন্দ্র মোদীর আমিষাশী বলিষ্ঠতা, তাঁরা ভাবছেন, গুজরাতের

মুখ্যমন্ত্রীকে যদি দিল্লির মসনদের অধিপতি বানিয়ে ফেলা যায়, তবে তাঁর কড়া হাতের শাসনে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন হবে, ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। এই লেখা লিখতে লিখতে খবরে পড়লাম জনসভায় তিনি বক্তব্য রাখার আগে মাইকে সিংহগর্জন বাজানো হচ্ছে। হতে পারে এর পেছনে চিন্তা হল এতে মানুষের সাথে পশুদের ভোটও পাওয়া যাবে। কিন্তু এখানে কেউ যদি একনায়কতন্ত্রের হুংকার শুনতে পান তাঁকে হয়তো দোষ দেওয়া যাবেনা। রাজনীতিকদের বাইরে? আন্না হাজারের সমর্থনে জড়ো হওয়া মানুষের ভিড়ের কথা ভাবুন। তাঁরা সত্যিই হয়তো ভেবেছিলেন সিদ্ধি রালেগাঁওয়ের এই বৃদ্ধ একা হাতে সাফ করে দেবেন ভারতের পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি।

অর্থাৎ, যাঁর হাতে আমরা নিজেদের সঁপে দিতে চাই, ঘুরেফিরে তাঁরা রাজনীতিরই লোক। গোটা দুনিয়াতেই। এই অভ্যাসটা, শুনতে আশ্চর্য লাগলেও, আন্তর্জাতিক এবং ঐতিহাসিক ভাবে সত্যি। রবার্ট মুগাবে থেকে মুয়াম্মর গদ্দাফি, ফিদেল কাস্ত্রো থেকে উগো চাভেস প্রত্যেকেই ক্ষমতায় এসেছিলেন বিরাট জনসমর্থনের ঢেউয়ে চড়ে। মানুষ তাঁদের 'সব সমস্যার একক সমাধান' হিসেবেই দেখেছিলেন। আর কারও ভরসায় না থেকে তাঁরাই, তাঁরা একাই, সব ঠিক করে দেবেন মানুষের মনে এই প্রত্যাশা ছিল। তার পর কী হল, কী হয়, সেটা নিয়েই বাকি লেখা জুড়ে কথা বলব। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রত্যাশাটি স্পষ্ট করে চিনে নেওয়া ভাল।

অর্থাৎ, দেশ, সমাজ উচ্ছন্নে যাচ্ছে দেখে যখন চরম অসহায় লাগতে থাকে, তখন এই একনায়কের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকে। স্বাভাবিক, তাই না? যিনি সব ঠিক করে দেবেন, তাঁর হাতেই তো সব ক্ষমতা থাকা উচিত। রাজনীতির ভাষায় তাঁকেই বলা হয় ডিক্টেটর বা একনায়ক। গণতন্ত্রের হট্টগোল এবং অকর্মণ্যতা দেখে বিরক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে অনেকেই ভাবেন, এর চেয়ে সেনাবাহিনীর হাতে ক্ষমতা থাকলে ভাল হত। অর্থাৎ, এমন এক জনকে চাই, যাঁর হাতে ক্ষমতা থাকবে অপরিসীম, আর সেই ক্ষমতা ব্যবহার করে তিনি পারবেন সব সমস্যার সমাধান করে দিতে। সেই কথা আছে না, মুসোলিনির সময় অন্তত ট্রেন সময়ে ছাড়ত! আমরা এক জন 'ভাল একনায়ক'-এর সন্ধানে আছি।

২

আমাদের একনায়ক-কামনার মধ্যে 'ভাল' শব্দটির গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থাৎ সেই মানুষটি, যিনি তাঁর অসীম ক্ষমতা ব্যবহার করে আমাদের ভাল করবেন শুধু, আমাদের ক্ষতি হতে পারে, এমন কোনও কাজ ভুলেও করবেন না। আমাদের অবচেতনে যা থাকে, তা সম্ভবত এই– গণতন্ত্রের শ্লথতাটুকু ছেঁটে ফেলে তার সব গুণ বজায় রাখবেন আমাদের সেই স্বপ্নের একনায়ক।

প্রশ্ন হল, যিনি একনায়ক, তিনি কি কখনও ভাল হতে পারেন? অভিজ্ঞতা বলছে, না। কাস্ত্রো থেকে পিনোশে, মোয়াম্মর গদ্দাফি থেকে রবার্ট মুগাবে, জিয়া উল হক থেকে মহেন্দ্র রাজাপক্ষ, গোটা দুনিয়ার কোথাও 'ভাল একনায়ক'-এর দেখা মেলেনি। কেন কোনও একনায়ক 'ভাল' হতে পারেন না, আমরা এই লেখা জুড়ে এই প্রশ্নটিরই উত্তর খুঁজব। কিন্তু তার আগে একটু ভেঙে দেখা যাক, 'ভাল' বলতে ঠিক কী বোঝায়।

তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক, এক জন ভাল একনায়কের সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু, তিনি কার জন্য ভাল? তিনি যদি শিল্পের জন্য ভাল হন, সম্ভবত অরণ্যের ওপর নির্ভরশীল আদিবাসীদের জন্য খুব ভাল নন। যদি তিনি হিন্দুদের জন্য ভাল হন, হয়তো মুসলমানদের জন্য মৃত্যুদূত। আজ যাঁরা নরেন্দ্র মোদী কে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে ব্যাকুল হয়েছেন, তাঁরাও একনায়ক চান। শিল্পবান্ধব একনায়ক। কিন্তু মোদী আর ক'জনের জন্য ততটাই ভাল, এক বার খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

মোদীর উন্নয়নের খতিয়ানই খানিক শোনা যাক। তাঁর রাজ্যে পরিকাঠামো তৈরি হয় শুধুমাত্র শিল্পপতিদের প্রয়োজনে র কথা মাথায় রেখে। তার জন্য যদি মুছে ফেলতে হয় বিস্তীর্ণ জনবসতি, তা -ও সই। মোদীর জনসংযোগ সংস্থা নিপুণ ভাবে প্রচার করে গিয়েছে, গুজরাতে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক। পশ্চিমবঙ্গে হাজার একর জমি না পেয়ে টাটা ন্যানোর কারখানা যখন গুজরাতের সানন্দে পৌঁছেছিল, তার জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছিল ৫০০০ একর। ২০০০ কৃষক প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিলেন। তাঁরা জমি দিতে চাননি। ২০১২ সালের অগস্টে ভদোদরা এবং সংলগ্ন ভারুচ জেলার ৬০টি গ্রামের কৃষক প্রতিবাদে নেমেছিলেন। তাঁদের অভিযোগ, গুজরাত ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন অতি সামান্য ক্ষতিপূরণ দিয়েই জমি দখল করে নিচ্ছে। ২০১৩-র মার্চে ভদোদরার সাওলি অঞ্চলে বিপুল প্রতিবাদ হয়েছিল। অভিযোগের তির সেই জিআইডিসি-এর দিকেই। স্পেশাল ইনভেস্টমেন্ট রিজিয়ন অ্যাক্ট-এ নির্বিচারে কৃষি জমি অধিগ্রহণ নিয়েও আন্দোলন হয়েছে। উপকূলবর্তী মু ন্দ্রা অঞ্চলে আদানি ও টাটা গোষ্ঠীর শিল্প, বন্দর এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিবাদ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তালিকাটি দীর্ঘতর করে লাভ নেই। গুজরাতে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে কী পরিমাণ আন্দোলন গত পাঁচ বছরে হয়েছে, এক বার গুগ্‌ল সার্চ করলেই দেখতে পাবেন।

নরেন্দ্র মোদী সেই আন্দোলনকে পাত্তা দেননি। মহুয়ায় নিরমা-র সিমেন্ট কারখানা পরিবেশের বিপুল ক্ষতি করবে, সেটা জানার পরও এক চুল সরেননি নিজের সিদ্ধান্ত থেকে। ভাবনগরে পারমাণবিক চুল্লি নির্মাণের জন্য পরিবেশের ছাড়পত্রসম্পর্কিত সমস্যা আছে অভিযোগ ওঠার পরেও নথিপত্র প্রকাশ করেননি। অভিযোগ উঠেছে, জিআইডিসি ১৯৮০-র দশকে যে জমি অধিগ্রহণ করেছিল সরকারি প্রয়োজনের কথা বলে, সেই জমিই এখন জলের দরে দেওয়া হচ্ছে মোদী-ঘনিষ্ঠ শিল্পপতিদের। তাঁর আমলে যত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ছাড়পত্র পেয়েছে, তার অনেকগুলিতেই শেষ পর্যন্ত শিল্প তৈরি হয়নি কিন্তু জমি রয়ে গিয়েছে সেই বিনিয়োগকারীদের হাতেই। সেই জমির কী হবে, অনুমান করা চলে। মোদী কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দেন না।

মোদীর 'উন্নয়ন'-এর এ এক খণ্ডচিত্রমাত্র। কিন্তু এতে মূল সুরটা বোঝা যায়। তাঁকে একনায়ক বললে হয়তো এখনও অনেকেই আপত্তি করবেন, কিন্তু তাঁর চলার ধরনটা যে একনায়কদের পথেই, সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁর উন্নয়নের মডেল এক শ্রেণির মানুষের বিলক্ষণ পছন্দ। যেমন, দেশের সব বড় শিল্পপতি, অথবা পাশ্চাত্যের স্বচ্ছল জীবনযাপনের প্রতি আকৃষ্ট শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি। ফলে, মোদী তাঁদের–কাছে 'ভাল একনায়ক'। কিন্তু যাঁরা শুধু শিল্প চান না? যাঁরা অরণ্যের ওপর নির্ভরশীল, যাঁদের জীবিকা নির্ভর করে থাকে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার সুযোগের ওপর? মুন্দ্রা

অঞ্চলে যে মৎস্যজীবী মানুষরা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন প্রাণপণ, তাঁদের কাছে মোদী ‘ভাল একনায়ক’ হতে পারেন না। ভাবনগরে পারমাণবিক চুল্লি তৈরি করার জন্য জমি অধিগ্রহণ যাতে সস্তায় হয়, তার জন্য মোদীর প্রশাসন সে অঞ্চলের অতি উর্বর জমিকে পতিত জমি হিসেবে দাগিয়ে দিয়েছে। যাঁরা সেই জমির ফলনের ওপর নির্ভরশীল, তাঁদের কাছে মোদী একনায়ক বটে, কিন্তু কোনও অর্থেই ভাল নন।

উন্নয়নের জন্য একনায়ক প্রয়োজন, গোটা দুনিয়ায় এমন একটা ধারণা প্রায় বদ্ধমূল করে দিয়েছে চিন। গত ত্রিশ বছর ধরে এই দেশটা বছরে গড়ে ১০ শতাংশ হারে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়িয়ে চলেছে। গোটা দুনিয়ার ইতিহাসে এমন রুদ্ধশ্বাস আর্থিক বৃদ্ধি কেউ কখনও দেখেনি। সে দেশে গণতন্ত্রের নামগন্ধ নেই। এক জন একনায়ক নেই বটে, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিই সেই একনায়কের আসন আলো করে বসে। চিনের এই বৃদ্ধি দেখে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগছে, তা হলে কি গণতন্ত্র আর্থিক বৃদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকর? একনায়কের হাতে দেশ ছেড়ে দিলেই কি সবার ভাল? এই প্রশ্নের উত্তর যে ‘না’, তা চিনের অভিজ্ঞতাই বলছে। সেখানের হুবেই প্রদেশে তৈরি হচ্ছে ‘থ্রি গর্জেস ড্যাম’, পৃথিবীর বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। তার জন্য সম্পূর্ণ ভেসে গিয়েছে তিনটি শহর। গৃহহীন হয়েছেন মোট কত মানুষ, সে হিসেব পাওয়া মুশকিল। তবে, অন্তত পঞ্চাশ লক্ষ। শিল্প এবং পরিকাঠামোর জন্যে জমি অধিগ্রহণের ফলে ৪ কোটির বেশি কৃষক জমি হারিয়েছেন এবং শুধু ২০০৬ সালের প্রথম নয় মাসেই প্রায় আঠেরো হাজার কৃষক আন্দোলনের হিসেব পাওয়া যাচ্ছে যাতে অংশগ্রহণ করেছেন প্রায় চার লক্ষ কৃষক।[i]

চিন এবং পূর্ব-প্রাচ্যের কিছু দেশের (যেমন দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর) সাম্প্রতিক ইতিহাসে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার অত্যন্ত চড়া হয়েছে গণতন্ত্রের অভাব সত্ত্বেও। তাই কেউ কেউ মনে করেন জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির জন্যে ভালো একনায়কের প্রয়োজন। যদি ধরেও নিই যে জাতীয় আয় বৃদ্ধিই একমাত্র সামাজিক লক্ষ্য, পূর্ব-প্রাচ্যেরই এমন অনেক দেশ রয়েছে, যেখানে একনায়কতন্ত্র আছে কিন্তু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির রেকর্ড ভালো নয় (যেমন, উত্তর কোরিয়া, মায়ানমার)। শুধু তাই নয়, যদি একনাযক-শাসিত দেশগুলোর সঙ্গে গণতান্ত্রিক দেশের তুলনা করি, তা হলে দুটি জিনিস দেখা যায়– এক, গড়ে গণতন্ত্রে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার বেশি আর, দুই, একনায়কতন্ত্রে হয় বৃদ্ধির হার খুব বেশি নয়তো খুব কম। বিনিয়োগের জগতের ভাষায় বললে, একনায়কতন্ত্রে লাভ কম এবং ঝুঁকি বেশি!

কিন্তু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার তো উন্নয়নের একমাত্র সূচক নয়। গণতন্ত্রে বিরোধী দল, জনমত, মিডিয়া, আইন-ব্যবস্থা এবং নাগরিক সমাজের চাপে সরকারি দলের পছন্দের যে নীতিই হোক না কেন, তার থেকে কিছুটা পেছনে সরতে হয়, কিছুটা আপস করতে হয়। তাই সরকারের বা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নিজস্ব মতামত যাই হোক, উন্নয়নের নানা সূচক (যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আয় বণ্টনে অসাম্য, পরিবেশ) নিয়ে সব সময়েই বিতর্ক চলছে। তাই, যে কোনও সূচকের প্রভুত উন্নতি হয়েছে বলে সরকার বসে থাকতে পারে না। অন্যান্য সূচকে কেন সমপরিমাণ বা গ্রহণয়োগ্য রকম উন্নতি হয়নি, সরকারকে সেই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। একনায়কতন্ত্রে এই সব বাধানিষেধ নেই। ফলে, কোনও একনায়ক যদি মনে করেন যে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হারকে একটা মারাত্মক উঁচু স্তরে নিয়ে যাওয়াই তাঁরা একমাত্র অভীষ্ট, তিনি তা-ই করতে পারেন। অতএব, জাতীয় আয় বাড়ানোর কাজে তিনি তুমুল সফল হতেই পারেন।

কিন্তু তার জন্যে জনসংখ্যার বড় একটা অংশকে উদ্বাস্তু করতে এবং তার থেকে কোন বিক্ষোভ দেখা দিলে তা নির্মম ভাবে দমন করতে তারা এক মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করবেন না।[ii] অথবা, বাঁধনহীন অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ফলে পরিবেশ দূষণের সমস্যা সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে– সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা অনুযায়ী পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত কুড়িটি শহরের মধ্যে ষোলটাই চিনে!

চিনের কথা বাদ দিয়ে যদি বিভিন্ন দেশের পরিসংখ্যানভিত্তিক তুলনা করা হয়, তাহলে জানা যাচ্ছে যে একটা দেশের গণতন্ত্রর বিকাশ যত হয়, জাতীয় আয়ের অনুপাতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য -র ওপরে সরকারি খরচ তত বাড়ে।[iii] অর্থাৎ, দুটি দেশের মধ্যে একটি যদি একনায়ক-শাসিত হয় এবং অপরটি গণতান্ত্রিক, তা হলে এই দুটি দেশে জাতীয় আয় সমপরিমাণে বাড়লেও মানব-উন্নয়নে ফারাক থেকে যাবে। গণতান্ত্রিক দেশটিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো কল্যাণ-খাতে খরচের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি হবে। অর্থাৎ, কোনও দেশে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক বৃদ্ধি উন্নয়নের ওপর কতখানি প্রভাব ফেলবে, নির্ভর করে দেশটির গণতান্ত্রিক চরিত্রের ওপর– অর্থাৎ দেশটি আদৌ গণতান্ত্রিক কি না, গণতান্ত্রিক হলেও সেই গণতন্ত্র কতখানি গভীর, এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের ওপর। কাজেই, "ভাল" একনায়ক যদি হয়ও, তিনি কার জন্য ভাল, কে বলবে?

৩

ওয়েলফেয়ার ইকনমিকস বা কল্যাণ-অর্থনীতির একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছেন স্যোশাল প্ল্যানার বা সামাজিক পরিকল্পক। তাঁর তাত্ত্বিক সংজ্ঞাই এই রকম– সমাজের সকলের জন্য শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যাবে, তিনি এমন ব্যবস্থা করেন। সব সিদ্ধান্ত করার ক্ষমতা তাঁর, এবং তিনি যা চাইবেন, ঠিক সেই কাজটাই করতে পারবেন। অর্থাৎ, তিনি সকলের জন্যই 'ভাল একনায়ক'। কল্যাণ অর্থনীতির যে কোনও মডেলেই দেখে নেওয়া হয়, স্যোশাল প্ল্যানার থাকলে তিনি কী সিদ্ধান্ত করতেন। তাঁর সিদ্ধান্ত, সেটা বাস্তবে সম্ভব হলে, নিশ্চিত ভাবেই গোটা সমাজের জন্য সবচেয়ে ভাল। কাজেই, স্যোশাল প্ল্যানার সলিউশনকে মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করাই দস্তুর। কিন্তু, এই ভাল একনায়ক আসলে, অর্থনীতির তত্ত্বেও, সোনার পাথরবাটি বই আর কিছু নন। তার দুটো মূল কারণ আছে।

প্রথমত, তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখলেও, কী ভাবে সমাজের সবার "ভালো" যোগ করে এক জন ভালো স্যোশাল প্ল্যানার পাওয়া যায়, সেটা নিয়ে অনেক জটিলতা আছে। অর্থনীতির একটি বিশেষ শাখা, স্যোশাল চয়েস থিয়োরি বা সামাজিক চয়নতত্ত্ব এই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করে। সেই তত্ত্বের বিশদ আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। শুধু এটুকুই বলার যে সমাজের প্রতিটি মানুষের পছন্দ-অপছন্দ (অর্থনীতির পরিভাষায় যাকে বলে প্রেফারেন্স) যোগ করে যদি সামাজিক পছন্দ-অপছন্দ বার করি, তাহলে তার মধ্যে কিছু যুক্তিগত অসঙ্গতি থেকে যাবে।[iv] এই সমস্যার সমাধান? এই সামাজিক পছন্দ-অপছন্দ হতে হবে যে কোনও একজন নাগরিকের পছন্দ-অপছন্দের সমান। তাহলে যুক্তিগত অসঙ্গতির সমস্যা থাকবেনা, কিন্তু এর মানে দাঁড়ালো এই নাগরিক হলেন একনায়ক! সব নাগরিকের পছন্দ-অপছন্দ

এক হলে কোন সমস্যা নেই, তা না হলে হয় একনায়কের যা পছন্দ সবার তা পছন্দ হতে হবে, আর তা না হলে গণতন্ত্রের ডামাডোল!

দ্বিতীয়ত, যদি ধরেও নেওয়া যায় এক জন স্যোশাল প্ল্যানার আছেন যিনি সমাজের সার্বিক ভালমন্দ ঠিকঠাক খেয়াল রাখেন, তাঁর পক্ষে সঠিক সিধান্ত নেওয়ার পথে বাধা প্রচুর । সামাজিক পরিকল্পনার সমস্যা নিয়ে ভাবনাচিন্তায় বিশ শতকে যে ক'জন অর্থনীতিবিদ সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন, ফ্রেডরিক অগস্ট ফন হায়েক তাঁদের মধ্যে পথিকৃৎ বলে পরিচিত। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত তাঁর 'দ্য ইউজ অব নলেজ ইন স্যোসাইটি' শীর্ষক নিবন্ধে সামাজিক পরিকল্পনার অসম্ভাব্যতা বিষয়ে লিখেছিলেন। তাঁর একেবারে প্রথম পরিচ্ছেদেই তিনি লিখছেন :

> 'What is the problem we want to solve when we try to construct a rational economic order? On certain familiar assumptions the answer is simple enough. *If* we possess all the relevant information, *if* we can start out from a given system of preferences, and *if* we command complete knowledge of available means, the problem which remains is purely one of logic.'

তার মানে স্যোশাল প্ল্যানার বা ভাল একনায়ককে সফল হতে হলে এই তিনটি শর্ত পূরণ করতেই হবে : এক, তাঁর কাছে দুনিয়ার সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য থাকতে হবে; দুই, তাঁকে জানতে হবে, তাঁর সমাজের প্রতিটি মানুষ কি চান, এবং তিন, প্রযুক্তি ও নানা সম্পদের সহায়তায় কি কি, কতটা করে, এবং কি ভাবে উৎপাদন করা সম্ভব তার সমস্তটা তাঁকে জানতে হবে। হায়েকের এই তিনটি দাবির সঙ্গে আরও দুটো, খুব যুক্তিগ্রাহ্য দাবি জুড়ে নেব আমরা : চার, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হয় তাঁর জ্ঞান নিখুঁত হতেই হবে আর তা যদি না হয়, অনিশ্চয়তার মোকাবিলায় সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এবং পাঁচ, এই একনায়ক যা করতে চাইবেন, তাঁর অধস্তন কর্মীরাও ঠিক সেটাই চাইবেন, অর্থাৎ পরিকল্পনার রূপায়ণে কোথাও কোনও সমস্যা বা স্বার্থের সংঘাত থাকবে না । এই পাঁচটি শর্ত পূরণ করতে পারলেই স্যোশাল প্ল্যানার যা করতে চান, তা করা সম্ভব হবে।

শুনে দুশ্চিন্তা হচ্ছে? হবারই কথা। বিভিন্ন নাগরিকের ভালো ও মন্দের যোগফল কি করে করা হবে এবং ভালো একনায়ক যদি থাকেনও, তাঁর পরিকল্পনা রচনা এবং রূপায়ণের পথে কি কি বাধা এই সমস্যাগুলি নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

৪

যে কোনও সিদ্ধান্তই সমাজের একটি অংশের উপকার করলে অন্য একটি অংশের অপকার করে। লেখার গোড়ায় আমরা এই সমস্যার কথা উল্লেখ করেছিলাম। যেমন ধরুন কৃষি থেকে শিল্পে যাওয়ার প্রক্রিয়া। কোনও একটি জমিতে শিল্প হলে সমাজের একটি অংশের উপকার হবে, কৃষি বন্ধ হয়ে গেল ক্ষতি হবে একেবারে অন্য একটি অংশের। এ বার আমাদের একনায়ক যাবেন কোন দিকে?

সুপারম্যানের গল্প থেকে আমাদের রাজনৈতিক কল্পনা, যেখানেই একনায়কের দেখা পাই না কেন, তার একটা নির্দিষ্ট ধাঁচ আছে। সেখানে এক দিকে থাকে ভাল লোক, আর অন্য দিকে মন্দ লোক। ফলে, সামাজিক কল্যাণের পথ বাছতে সমস্যা নেই। সুপারম্যান দুষ্টের দমন করবেন, তার ফলে আপনাআপনিই শিষ্টের পালন হয়ে যাবে। এখানেই এক পক্ষের লাভ আর অন্য পক্ষের ক্ষতির গল্প আছে, নিঃসন্দেহে। কিন্তু এই আখ্যানে যেহেতু এক পক্ষে ভাল লোক আর অন্য পক্ষে খারাপ, তাই অসুবিধে নেই। খারাপ লোকের ক্ষতি নিয়ে মাথা ঘামাতে আমাদের ভারী বয়ে গেছে।

আধুনিক রূপকথার সুপারম্যানকে যদি বাদও রাখেন, আমাদের রাজনৈতিক আখ্যানগুলোর চরিত্র একটু ভেবে দেখা যেতে পারে। সেখানেও কিন্তু মন্দ-ভালর বিভাজিকা অতি স্পষ্ট। কোনও রাজনৈতিক ভাষ্যে মন্দ লোক মানে হল ধনতান্ত্রিক পুঁজিপতি, কোথাও আবার মন্দ লোক মানে ঘুষখোর রাজনীতিক বা সরকারি কর্মচারী। মন্দ লোকের নাম - পরিচয় যাই হোক না কেন, প্রতিটি গল্পেই তারা হল ‘অপর’, অর্থাৎ যার ভাল-মন্দ নিয়ে সমাজের কিছু এসে যায় না। ফলে, তাদের ক্ষতির মূল্যে আমাদের লাভ হওয়ার মানেই সামাজিক কল্যাণের পরিমাণ বাড়া।

বাস্তবের ছবিটা তুলনায় অনেক জটিল। সেখানে অনেক সময়েই তেমন কোনও ‘মন্দ লোক’ নেই। আবারও কৃষি-শিল্পের উদাহরণে ফিরে যাই। সিঙ্গুরের মতো কোনও একটি কৃষিজমিতে যদি শিল্প তৈরি হয়, তবে সমাজের প্রশিক্ষিত কর্মসংস্থানহীন ছেলেমেয়েদের লাভ, কিন্তু এত দিন যাঁরা সেই জমিতে চাষ করতেন, তাঁদের ক্ষতি। আবার, শিল্প যদি না হয়, পশ্চিমবঙ্গে যেমন, তবে বেকার ছেলেমেয়েদের ক্ষতি কিন্তু কৃষকদের লাভ। মুশকিল হল, এখানে দু ’পক্ষই ভাল। ফলে, এক জনের ক্ষতি করে অন্য জনের লাভের ব্যবস্থা হলে তাকে সামাজিক কল্যাণবৃদ্ধি বলার কোনও উপায় নেই।

অর্থনীতিশাস্ত্রে এই সমস্যা এড়াতে একটা চালাকির আশ্রয় নেওয়া হয়। ধরে নেওয়া হয়, বিভিন্ন নীতির ফলে সবার ওপর যা প্রভাব হবে, স্যোশাল প্ল্যানার তার প্রতিটি আলাদা ভাবে বিবেচনা করে দেখবেন, কোনটায় সার্বিক কল্যাণ সবচেয়ে বেশি হচ্ছে। এর পেছনে আছে উপযোগিতাবাদের (utilitarianism) দর্শন। এর সমস্যা হল, ধরুন কোন নীতির ফলে আপনার লাভ হল ১০০ টাকা আর আমার ক্ষতি হল ৫০ টাকা, অর্থাৎ সমাজের দিক থেকে দেখলে নীট লাভ হল ৫০ টাকা। উদাহরণ হিসেবে ভাবতে পারেন আমি অটোচালক, আপনি পথচারী আর দূষণবিরোধী নী তি পাশ করা হল। উপযোগিতাবাদ বলবে নীতিটা গ্রহণ করা উচিত কারণ আপনার যা লাভ তার থেকে আপনি আমায় ক্ষতিপূরণ দিতে পারেন যাতে আমরা দুজনেই লাভবান হলাম। যদি কোনও প্রকল্প এইরকম উদ্বৃত্ত তৈরি না করতে পারে, তবে কাজটা না করাই বিধেয়।

চমৎকার প্রস্তাব। কিন্তু, তত্ত্বে কথাটা শুনতে যতটা ভাল লাগে, তার বাস্তবায়ন ততখানি সহজ নয়। কুশলী ভাবে এই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যে কোনও প্ল্যানারের পক্ষেই কঠিন, তা তিনি যতই সদিচ্ছা পোষণ করুন না কেন। কোনও প্রকল্পে এক পক্ষের কতটা ক্ষতি হচ্ছে, আর অপর পক্ষের কতটা লাভ হচ্ছে, সেটা হিসেব করা দুরূহ। যাঁদের ক্ষতি হচ্ছে, তাঁরা স্বভাবতই সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে বলবেন, আর যাঁদের লাভ হচ্ছে, তাঁরা সম্ভাব্য লাভের পরিমাণ কমিয়ে বলবেন।

এটা যে তাঁরা সবসময় শয়তানি করার জন্যই করেন, এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। ফলিত মনস্তত্ত্বের গবেষণায় বার বার দেখা গিয়েছে, মানুষ ক্ষতিকে ভয়ানক ভয় পায়, ফলে ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। ধরুন, আপনাকে বলা হল, হয় আপনি পঞ্চাশ টাকা পাবেন, আর নয়তো একটা কয়েন টস করার পর হেড পড়লে আপনি ১০০ টাকা পাবেন, আর টেল পড়লে কিছুই পাবেন না। সংখ্যাতত্ত্বের প্রাথমিক জ্ঞানটুকু আছে, এমন ছাত্রমাত্রেই আপনাকে বলে দেবে, দুটো আসলে এক কথা। কয়েন টস করার ক্ষেত্রেও আপনার প্রত্যাশিত প্রাপ্তি ৫০ টাকাই। কিন্তু নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে দেখুন, খুব সম্ভব আপনিও বেশির ভাগ মানুষের মতো ঝুঁকিহীন ৫০ টাকাই পেতে চাইবেন। বস্তুত, ঝুঁকি যদি নিতেই হয়, আপনি সেই ঝুঁকির জন্য বেশি টা কা দাবি করবেন।

মূল কথাটা পরিষ্কার - সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে ভাবা এবং সম্ভাব্য লাভের কথা কমিয়ে ভাবা মানুষের চরিত্রগত। কাজেই, লাভ-ক্ষতির পরিষ্কার হিসেব পাওয়া যাবে না, ফলে ক্ষতিপূরণের অঙ্কও বোঝা সম্ভব হবে না। তাই যে নীতির ফলে আখেরে সবারই লাভ হতে পারত, তা অনেক সময়েই বাস্তবায়িত হবেনা।

এক জন প্ল্যানারের পক্ষে যেটা দুরূহ সমস্যা, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বাজার ব্যবস্থায় প্রতিনিয়ত তার একটা চলনসই সমাধান পাওয়া যায়। আপনার যে জমি বা ফ্ল্যাট আছে তার মূল্য যদি আমার কাছে আপনার থেকে অনেক বেশি হয়, তাহলে খানিক দরাদরি করে তা আমি কিনে নিতে পারব। আবার তার মূল্য যদি আপনার কাছে অনেক হয় (ধরুন তা আপনার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অনেক স্মৃতিবিজড়িত একটি বাড়ি) তাহলে যতই কেউ দাম হাঁকাক, আপনি সেটা বেচবেন না। এই অবধি ঠিক আছে। বাজারের এই সমাধান অবশ্যই সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যদি কোন লেনদেনের প্রভাব যদি তৃতীয় ব্যক্তির ওপর পড়ে (যেমন, পরিবেশ দূষণ) তা হলে বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। আবার কোন শিল্প বা পরিকাঠামো প্রকল্পের জন্যে একই জায়গায় যদি অনেক মালিকের কাছ থেকে জমি কেনা প্রয়োজন হয়, তখন তা বাজারের হাতে ছেড়ে দিলে সেখানে কিছু হওয়া মুশকিল, কারণ কেউ কেউ সত্যি জমি ছাড়তে রাজি নন বলে আবার কেউ দাম বাড়বে বলে লাভের আসায় বসে থাকবেন। এই ধরণের পরিস্থিতিতে কি করণীয় সেটা নিয়ে অন্যত্র লিখেছি।[৮] কিন্তু বাজারের ক্ষেত্রে এই উদাহরণগুলো হল ব্যতিক্রম। আর প্ল্যানারের ক্ষেত্রে আলু-পটলের উৎপাদন বা বণ্টন থেকে শুরু করে শিল্পায়ন, সর্বত্রই বিভিন্ন নাগরিকের লাভক্ষতির যোগ বিয়োগ করে সিদ্ধান্তে আসতে হবে । কাজটা শক্ত মনে হচ্ছে? এখনও তো প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ, বিশ্লেষণের এবং রূপায়ণের কথায় আসিনি।

৫

সব তথ্য জানা ব্যাপারটা আসলে কী? ছোট উদাহরণ দিয়ে শুরু করা যাক। একটা দাবার বোর্ডের কথা ভাবুন। মোট ৬৪টা খোপ রয়েছে, ৩২টা গুটি। রাজা, মন্ত্রী, গজ, ঘোড়া, নৌকা আর বোড়ে মোট ছ'রকম ভাবে চলতে পারে দু'পক্ষের ৩২টি গুটি। এই দাবার বোর্ডে কত রকম চাল সম্ভব? হিসেব করেছিলেন ইনফর্মেশন থিয়োরি-র জনক ক্লড শ্যানন। তিনি বলেছিলেন, পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে যত মিলিসেকেন্ড অতিবাহিত হয়েছে, তার চেয়েও বেশি চাল সম্ভব। ভাবুন!

এতেই যদি মাথা গুলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তবে খেলা পাল্টানো যাক। বিলিয়ার্ডের বোর্ডে চলে আসি আমরা। ধরুন, কেউ অঙ্ক কষে বলতে চান, প্রতিটি শটের পর বলগুলির সম্ভাব্য অবস্থান কী হতে পারে? ১৯৭৮ সালে গণিতজ্ঞ স্যর মাইকেল বেরি তাঁর 'রেগুলার অ্যান্ড ইর্রেগুলার মোশান ইন ননলিনিয়ার মেকানিকস' প্রবন্ধে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন। নাসিম নিকোলাস তালেব তাঁর 'দ্য ব্ল্যাক সোয়ান: দি ইমপ্যাক্ট অব দ্য হাইলি ইমপ্রোবাবল' বইয়ে সেই প্রবন্ধের কথা লিখেছেন। তিনি লিখছেন:

> 'বলগুলো গোড়ায় যখন স্থির অবস্থায় আছে, তখন যদি সেগুলোর সম্বন্ধে প্রাথমিক তথ্যগুলো আপনার হাতে থাকে, যদি আপনি বিলিয়ার্ড টেবিলের রোধ বা রেজিস্ট্যান্স জানেন (যেটা জানা খুব কঠিন নয়) এবং প্রথম যে শটটি মারা হল, তার অভিঘাত যদি হিসেব করতে পারেন, তবে প্রথম হিটের পর টেবিলে বলগুলির অবস্থান কী হবে, সেটা হিসেব করা সোজাই। দ্বিতীয় রাউন্ডের পর হিসেব কষা অপেক্ষাকৃত কঠিন, কিন্তু অসম্ভব কিছু নয়। গোড়ায় বোর্ডের অবস্থা কেমন ছিল, সেটাকে একটু মন দিয়ে খেয়াল করতে হবে, এবং একটু নিখুঁত হতে হবে। নবম শটের পর বোর্ডের অবস্থা কী হবে, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বেরোলে বুঝবেন সমস্যা কাকে বলে। টেবিলের পাশে যে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে, তাকে পৃথিবী নিজের কেন্দ্রের দিকে কী বলে আকর্ষণ করছে, সেটাও হিসেব করতে হবে আপনাকে। আর, ৫৬তম শটের পর কী হবে, সেটা জানতে চাইলে এই ব্রহ্মাণ্ডে উপস্থিত প্রতিটি মৌলিক কণা আপনার হিসেবে ঢুকে পড়বে। আজ্ঞে, এই ব্রহ্মাণ্ডের একেবারে শেষ প্রান্তে, আমাদের চেয়ে এক হাজার আলোকবর্ষেরও বেশি দূরে রয়েছে যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ইলেকট্রন কণা, তাকেও আপনার হিসেবে রাখতে হবে, কারণ আপনার বিলিয়ার্ড বোর্ডে তারও অর্থপূর্ণ প্রভাব পড়ছে।... আমরা গ্রহ-নক্ষত্রের মতো বড় জিনিসের চলাফেরা এবং সম্ভাব্য অবস্থান অনেক সহজে হিসেব করতে পারি (যদিও সুদূর ভবিষ্যতে কী হবে, সেটা বলা এখনও কঠিন), কিন্তু ছোট জিনিসের ক্ষেত্রে হিসেব করা অনেক মুশকিল ছোট জিনিসের সংখ্যা বেশি বলেই। '

ভেবে দেখুন। বিলিয়ার্ড টেবিলের সামান্য কয়েকটা বল, মাত্র ৫৬ বার চলাফেরার পর, কোথায় থাকবে সে হিসেবে ঢুকে পড়ছে গোটা ব্রহ্মাণ্ড। সুপার-কম্পিউটারের বাবার অসাধ্য সেই হিসেব কষে ফেলা। সেখানে ভাল একনায়কের কারবার মানুষ নিয়ে, যার গতি নিশ্চিত ভাবেই বিলিয়ার্ড টেবিলে থাকা বলের তুলনায় বিচিত্রতর। কেন সামাজিক পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হতে পারে না, তার দুটো কারণ এই বিলিয়ার্ড বোর্ডের উদাহরণ থেকে শিখে নেওয়া যায়। এক, বলগুলোর মতোই, সমাজভুক্ত মানুষও একে অপরের সঙ্গে বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন দফায় আদানপ্রদান করে। দুই, সেই আদানপ্রদান চরিত্রে সরলরৈখিক বা লিনিয়ার নয়। তার চরিত্র নন-লিনিয়ার। সহজ ভাষায়, একটা আপাত-তুচ্ছ ঘটনার ফল মারাত্মক আকারের হওয়া সম্ভব।

সোজা কথায়, একার হাতে সবটা ঠিক করে দিতে গেলে যে পরিমাণ তথ্য আহরণ করা প্রয়োজন, কোনও মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, তা সে তিনি বারাক ওবামাই হোন বা ঠোঁট থেকে ঝুলন্ত সিগারেট-সহ খোদ রজনীকান্ত । তাঁর কাছে যত তথ্যই থাকুক, সমস্তটা বুঝতে সেই তথ্যের ভাণ্ডার আসলে অপ্রতুল।

আসুন, অর্থনীতির দুনিয়ায় কয়েক পা হাঁটা যাক। সেখানে তথ্যের সমস্যা কী ভাবে স্যোশাল প্ল্যানারের হাত বেঁধে দিতে পারে, তার একটা উদাহরণ দিই, হায়েকের পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ থেকে। একটামাত্র পণ্যের কথা ভাবা যা ক। হায়েকের প্রবন্ধে টিনের কথা আছে, অতএব টিনের উদাহরণটাই নিই। বিভিন্ন কারখানায় উৎপাদনের কাজে টিন ব্যবহৃত হয়। আবার, খনি থেকে টিন উত্তোলনের পর তা সেই কারখানাগুলোয় পৌঁছোয়। যে দেশে এই ঘটনাটি ঘটছে, সে দেশে এক জন স্যোশাল প্ল্যানার রয়েছেন। তিনি ঠিক করে দেন, টিনের দাম কী হবে। ধরা যাক, আমরা যে সময় থেকে এই দেশের দিকে নজর রেখেছি, সেই সময়ের গোড়ায় যত টিন উৎপন্ন হত, ঠিক তত টিনই ব্যবহৃত হত সব কারখানায়, স্যোশাল প্ল্যানারের ঠিক করে দেওয়া দামে। সব ঠিকঠাকই চলছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা ধাক্কা এল। একটা নতুন পণ্য আবিষ্কৃত হল, যাতে অনেক বেশি টিন প্রয়োজন হয়, আর যে পণ্যটা সমাজের পক্ষে অনেক বেশি জরুরি। ফলে, সেই ক্ষেত্রে টিনের চাহিদা গেল বেড়ে। এত দিন যাবত যত টিন উৎপন্ন হচ্ছিল, প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলোতে তার সবই ব্যবহৃত হচ্ছিল। নতুন চাহিদা তৈরি হওয়ায় বাজারে টিনের ঘাটতি বাড়বেই। স্যোশাল প্ল্যানা রের কাজটা কী দাঁড়াবে ভেবে দেখুন। তাঁকে হিসেব করে দেখতে হবে, নতুন খাতে যথেষ্ট টিনের জোগান দেওয়ার জন্য পুরনো খাতগুলোতে কতটা করে জোগান কমাতে হবে। সেই জোগান কমালে তার যে উৎপাদন কমবে, সেই ঘাটতি পূরণের কী ব্যবস্থা হবে। এবং, সেটা করতে গিয়ে যেখানে টান পড়বে, তার কী হবে ইত্যাদি। এই হিসেব না হয় কষতে আরম্ভ করলেন তিনি, কিন্তু তারই মধ্যে দেশের অন্য এক প্রান্তে হয়তো সন্ধান পাওয়া গেল টিনের নতুন ভাণ্ডারের। ফলে, এত কষ্টে কষা সব হিসেব গেল গুলিয়ে। ফের নতুন হিসেব। সে হিসেব শেষ হওয়ার আগেই যে পরিস্থিতি বদলে যাবে না ফের, সে নিশ্চয় তা নেই।

তা হলে উপায়? হায়েক একটা অতি-পরিচিত উপায়ের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। তার নাম বাজার ব্যবস্থা। তিনি লিখছেন, কোন পণ্য সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য যখন অনেক মানুষের মধ্যে বিস্তৃত তখন তার বাজার দাম বিভিন্ন মানুষের কর্ম ও পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয়সাধন করার ভূমিকা পালন করে, অনেকটা ট্র্যাফিক সিগনালের মত। অধিকাংশ টিনের ব্যবহারকারিদের এটা জানার দরকার নেই কোথায় টিনের চাহিদা বেড়েছে বা কেন । তাঁদের এটুকু জানলেই চলবে যে অন্য কোন ব্যবহারে টিনের উপযোগিতা বেড়েছে তাই তাঁদের টিনের ব্যবহারে একটু মিতব্যয়ী হতে হবে । এঁদের মধ্যে কেউ কেউ টিনের পরিবর্ত কোন দ্রব্যের ব্যবহার করতে শুরু করতে পারেন । এর ফলে টিনের চাহিদা কমবে, তার মূল্যবৃদ্ধি হ্রাস পাবে। কেউ কেউ আবার হয়ত কৌতূহলী হবেন জানতে কি সেই নতুন পণ্য যা বানাতে টিনের চাহিদা বেড়েছে এবং সেই ব্যবসায় তাঁরা বিনিয়োগ করতে পারেন। এর ফলে এই পণ্যের যোগান বাড়বে এবং তার দাম কমবে, যার ফলে টিনেরও দাম কমবে। সমগ্র বাজারের তুলনায় গুরুত্বে নগণ্য হলেও আপাতবিচ্ছিন্ন এই প্রত্যেকটি ব্যক্তি মানুষের নেওয়া ছোট ছোট সিদ্ধান্তের ফলে সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে এই পরিবর্তনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে, কোন কেন্দ্রীয় পরিকল্পকের সাহায্য ছাড়াই। অথচ এই সিদ্ধান্তকারীদের অধিকাংশই পুরো ছবিটা সম্পর্কে কোন পর্যায়েই পুরোপুরি অবহিত নন ।

এই হল বিকেন্দ্রীকরণের মূল কথা । মানবশরীরের অসংখ্য কোষ অনেকগুলো কাজই নিজেদের মত করে যায় আপাত কোন কেন্দ্রীয় পরিকল্পকের (অর্থাৎ, মস্তিষ্কের) নির্দেশনা ছাড়াই এবং এভাবেই মানবশরীর ছোটবড় অনেক পরিবর্তনের

মোকাবিলা করে। বাজারব্যবস্থায় সামগ্রিক অর্থনীতিও একইরকম বিকেন্দ্রীভূতভাবে কাজ করে। ফলে ছোটখাটো সমস্যার সমাধান খানিকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হয়ে যায়, টিনের উদাহরণটির মত। কিন্তু বড় সমস্যা হলে এই যুক্তিটি খাটেনা। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সঙ্কটে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছিল এবং তা ঠেকাতে বেশ কড়া হাতে সরকারকে হাল ধরতে হয়েছিল।

অর্থনীতিবিদরা সচরাচর অপ্রতুল সম্পদের সদ্ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বাজারব্যবস্থার দক্ষতায় (efficiency) মুগ্ধ। আমাদের আলোচনায় তথ্য আহরণ ও বিশ্লেষণে দক্ষতার কথা এলেও বাজার ব্যবস্থার যে সবচেয়ে বড় গুণের কথা আমরা বলছি তা হল তার নানা পরিবর্তনের সাথে মোকাবিলা করার জন্যে স্বয়ংক্রিয় শক্তসমর্থ (robust) প্রণালী থাকা। ছোটখাটো সমস্যা স্বয়ংক্রিয় ভাবে সমাধান হয়ে যায়, ঠিক আমাদের ছোটখাটো কেটে ছড়ে যাওয়া বা সর্দিকাশির মত। বড় সমস্যা হলে রুগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, এবং তখন সরকারের ভূমিকা প্ল্যানারের মতই হবে। তুলনায় সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া যখন সঙ্কটের মুখোমুখি হল, তখন হুড়মুড় করে গোটা ব্যবস্থাটা ভেঙ্গে গেল। এর পেছনে অনেক রাজনৈতিক এবং অর্থনীতিক কারণ আছে, কিন্তু অর্থনৈতিক কেন্দ্রীকরণ যে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে তা অস্বীকার করা মুশকিল। আমাদের শরীরের সাথে তুলনা টানলে বলতে হয় সব অসুখ যদি সোজা আমাদের মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে, তাহলে তা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য।

তর্কের খাতিরে ধরে নিই, একনায়কের পক্ষে এই মুহূর্তে যা জানা সম্ভব সেই সব তথ্যই আহরণ করা সম্ভব। কিন্তু তা হলেও ভবিষ্যৎ তো নানা অনিশ্চয়তার কুয়াশায় আচ্ছন্ন। এবং এই অনিশ্চয়তার মুখে পরিকল্পনা করতে গিয়ে আমাদের অনেকটা আন্দাজে ঢিল ছুঁড়তে হয়, অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে এগোতে হয়। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে এই রকম পরিস্থিতিতে মানুষের কিছু ভ্রান্তির প্রবণতা থাকে যা আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যতই হোক প্ল্যানার তো রক্তমাংসেরই মানুষ। সমগ্র অর্থনীতি নিয়ে পরিকল্পনা করতে গিয়ে সফল হতে পারবেন কি তিনি, নাকি আটকে যাবেন এক বিশেষ জালে, পরিভাষায় যাকে বলে 'প্ল্যানিং ফ্যালাসি'?

অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী মনস্তত্ত্ববিদ ড্যানিয়েল কানেম্যান তাঁর 'থিঙ্কিং, ফাস্ট অ্যান্ড স্লো' বইয়ে চমৎকার কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। প্রথম উদাহরণটিতে তিনি নিজেও এক জন চরিত্র। তিনি ইজরায়েলি প্রশাসনকে বলেকয়ে রাজি করিয়েছিলেন, হাইস্কুলের সিলেবাসে জাজমেন্ট এবং ডিসিশন মেকিং ঢোকাতে হবে। প্রশাসন রাজি হল। তাঁর ওপর সিলেবাস ঠিক করার, উপযুক্ত পাঠ্য বই তৈরি করার দায়িত্ব পড়ল। তিনি একটা টিম তৈরি করলেন। সেই টিমের সদস্য হলেন বেশ কিছু অভিজ্ঞ শিক্ষক, কানেম্যানের কয়েক জন ছাত্রছাত্রী এবং হিব্রু বিশ্ববিদ্যা লয়ের স্কুল অব এডুকেশনের তৎকালীন ডিন, সেমুর ফক্স। পাঠ্যক্রম নির্মাণে তিনি বিশেষজ্ঞ।

বছরখানেক ধরে কাজ চলল। প্রতি শুক্রবার মিটিং। সিলেবাসের বিস্তারিত রূপরেখা তৈরি হল, গোটাদুয়েক অধ্যায় লেখার কাজও শেষ। সবাই সন্তুষ্ট, কাজ দিব্যি এগোচ্ছে। এক দিন মিটিংয়ে আলোচনা চলছিল, কী ভাবে কোনও অনিশ্চিত বিষয়ের পরিমাপ করা সম্ভব, তা নিয়ে। হঠাৎ কানেম্যানের মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল এই যে তাঁদের কাজ, এটা কত দিনে শেষ হবে, সেটাও তো অনিশ্চিত। দেখা যাক, টিমের প্রত্যেক সদস্য নিজের মনে সেটা কী ভাবে মাপছেন। তিনি সবাইকে বললেন, হিসেব-টিসেব করে একটা কাগজে লিখে ফেলুন, আপনার মতে আমাদের এই কাজ শেষ হতে কত দিন সময় লাগতে পারে। প্রত্যেকে লিখলেন। দেখা গেল, দলের সবার মতের গড় নিলে আরও দু'বছরের মধ্যে কাজটি শেষ হওয়ার কথা। যাঁরা রক্ষণশীল, তাঁরা বলেছেন বছর আড়াই, আর যাঁরা সাহসী, তাঁদের মতে বড় জোর দেড় বছর।

এ বার কানেম্যান তাকালেন সেমুর ফক্সের দিকে। তিনি পাঠ্যক্রম নির্মাণ বিশেষজ্ঞ। কানেম্যান জানতে চাইলেন, আচ্ছা, এ রকম আর কোনও পাঠ্যক্রম স্থির করার টিমে কাজ করার অভিজ্ঞতা আপনার আছে নিশ্চয়ই। ফক্স জানালেন, বিলক্ষণ আছে। একাধিক দলের কাজ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত জানেন। কানেম্যান এ বার জানতে চাইলেন, আমাদের দলটা যতখানি এগিয়ে গিয়েছে, এই অবস্থা থেকে কাজ শেষ করতে অন্য দলগুলোর কী রকম সময় লেগেছে বলুন তো?

ফক্স চুপ করে গেলেন। বেশ খানিক ক্ষণ পরে যখন মুখ খুললেন, তাঁকে খানিক লজ্জিতই দেখাচ্ছিল। তিনি বললেন, আশ্চর্য, আমি তো এটা জানি, অথচ ভেবে দেখিনি যে আজ আমরা যে অবস্থায় আছি, যতগুলো দল অতীতে এত দূর এগিয়েছিল, তারা সবাই শেষ পর্যন্ত কাজটা শেষ করতেই পারেনি। একটা বড় অংশ মাঝপথেই হাল ছেড়ে দিয়েছে। কানেম্যান জানতে চাইলেন, মোটামুটি কত শতাংশ মাঝপথে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল? উত্তর এল, ৪০ শতাংশ। আর, যারা শেষ পর্যন্ত কাজটা শেষ করতে পেরেছিল, তাদের কী রকম সময় লেগেছিল? ফক্স উত্তর দিলেন, অন্তত সাত বছর তো বটেই। তবে, দশ বছরের বেশি কারও সময় লাগেনি।

পাঠক! এখানে একটু দাঁড়ান। ভেবে দেখুন, কানেম্যানের এই দলে কারা ছিলেন। তিনি নিজে (ভুলবেন না, পরবর্তী কালে তিনি যে নোবেল পেয়েছিলেন, সেটা তাঁর প্রাপ্তির তালিকায় এক নম্বরে নেই। তাঁর প্রধানতম প্রাপ্তি হল, ব্যবহারিক মনস্তত্ত্বের জগতে তাঁকে সবাই একবাক্যে গুরু মানে), বেশ কয়েক জন অতি অভিজ্ঞ শিক্ষক, মনস্তত্ত্বের গবেষক, এবং পাঠ্যক্রম নির্মাণের খ্যাতনামা এক বিশেষজ্ঞ। অথচ তাঁরাও, তাঁদের বিপুল জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, হিসেবে কী মারাত্মক ভুল করেছিলেন! তাঁরা যে ব্যর্থ হতে পারেন, এটা তাঁদের মনেও হয়নি। তাঁদের মতো দক্ষতার অন্য দলের যে কাজ শেষ করতে কম পক্ষে সাত বছর সময় লেগেছিল, তাঁরা সম্মিলিত ভাবে ধরেই নিয়েছিলেন সেই কাজ তাঁরা বছর দুয়েকে শেষ করে ফেলবেন।

এটাকে ওভারকনফিডেন্স বলে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাতে সমস্যা ফুরোয় না। মনস্তত্ত্বের দুনিয়ায় এই সমস্যাটি পরিচিত। এর মূলে কাজ করে একটা বিশ্বাস অবচেতনে তৈরি করে নেওয়া বিশ্বাস যে, আমি যে কাজটা করব, তাতে কোনও বাধাবিঘ্ন আসতে পারে না। এবং, আর পাঁচ জনের তুলনায় আমি কাজটা অনেক ভাল ভাবে করতে পারি।

বিশ্বের বিভিন্ন শহরে বারে বারেই একটা খুব সহজ এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে। যাঁরা গাড়ি চালান, তাঁদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে, আপনার শহরে যত লোক গাড়ি চালান, তাঁদের মধ্যে দক্ষতার তুলনায় আপনি গড়ের ওপরে, না নীচে? বারে বারেই দেখা গিয়েছে, অন্তত নব্বই শতাংশ মানুষ নিজের দক্ষতাকে গড়ের চেয়ে বেশি বলে জানিয়েছেন। সেটা হওয়া নিতান্ত পাটিগণিতের হিসেবেই অসম্ভব, তাই না? অর্ধেক মানুষকে তো গড়ের নীচে থাকতেই হবে। কিন্তু কেউই নিজের মনে মানতে রাজি নন, তাঁর দক্ষতা গড়ের চেয়ে কম। নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটন অঞ্চলে খোলা রেস্তোরাঁর মালিকদের ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা দেখিয়েছিল আর একটা এক্সপেরিমেন্ট। সেখানে নতুন রেস্তোরাঁ খুলে সেটা চালানো খুব কঠিন কাজ। দশটা রেস্তোরাঁ খুললে অন্তত ন'টাই বন্ধ হয়ে যায় অল্প দিনের মধ্যে। কিন্তু তবুও যাঁরা নতুন রেস্তোরাঁ খোলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেন যে তাঁদেরটা বন্ধ হবে না কোনও মতেই।

একেবারে নভিস রেস্তোরাঁমালিক অথবা আনাড়ি গাড়িচালক যে ভুলটা করেন, নোবেলজয়ী মনস্তত্ত্ববিদও সেই ভুলই করেছিলেন। অর্থাৎ, মানুষ হিসেবে আমরা এই ভুলের কাছে নিতান্ত অসহায়। ও আচ্ছা, বলাই হয়নি তো, কানেম্যানদের হিসেবটা কতখানি ভুল ছিল। তাঁদের বই, সে দিনের আলোচনার পরেও, শেষ হয়েছিল। তবে, সময় লেগেছিল আরও আট বছর।

ভেবে দেখুন, কানেম্যানদের হাতে কিন্তু সমস্ত তথ্য ছিল, দক্ষ পেশাদাররা ছিলেন, এবং সবচেয়ে বড় কথা, তাঁদের সবার উদ্দেশ্য ছিল বইটা শেষ করা। অর্থাৎ, আমাদের একনায়ক সবচেয়ে ভাল পরিস্থিতিতে যা যা আশা করতে পারেন, কানেম্যানদের হাতে তার সবটা ছিল। তবুও তাঁরা প্ল্যানিং ফ্যালাসির শিকার হয়েছিলেন। একনায়ক অবশ্য বলতে পারেন, 'আমার ক্ষেত্রে তেমনটা হবে না। আমি যা পরিকল্পনা করব, আমার কাজ সেই পরিকল্পনা অনুযায়ীই চলবে। ' এত দূর পড়ার পর আমরা একনায়কের এই অহেতুক আত্মবিশ্বাস দেখে হাসতেই পারি। কারণ, তাঁর কথাগুলো নিউ ইয়র্কের নতুন রেস্তোরাঁর মালিক অথবা বিভিন্ন শহরের গাড়িচালকদের মতো শুনতে লাগছে অনেকটা ।

ভুল হওয়া, ঠেকে শেখা এগুলো জীবনের অঙ্গ, সে কানেম্যান বা কমন ম্যান যেই হোন না কেন । ভবিষ্যৎ সবসময়েই অনিশ্চিত, তার জন্যে তো আর পরিকল্পনা করা বন্ধ করে দেওয়া যায়না, সে সরকারি কোন প্রকল্পই হোক বা বাড়িতে কি রান্না হবে তা হোক। আবার এও সত্যি যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং বাজেটের মধ্যেই অনেক পরিকল্পনা রূপায়িত হয়, সব ক্ষেত্রেই 'প্ল্যানিং ফ্যালাসি' কাজ করে তা নয়। যেমন, বিহারে নীতিশ কুমারের শাসনকালে প্রত্যয় অমৃত নামের এক আই এ এস অফিসার সময়সীমার মধ্যে এবং বাজেটের তুলনায় কম খরচে রাজ্যের রাস্তাঘাটের হাল অনেকটা ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে নিয়ে কাগজে লেখালিখিও হয়েছে।

তবে অগণিত মানুষের ছোট ছোট পরিকল্পনা এবং কাজের মধ্যে কিছু ভুল কিছু ঠিক হলে তার মোট ফল যা হবে, আর একজন একনায়কের সার্বিক পরিকল্পনায় ভুল হলে যা পরিণাম হবে, তার মধ্যে আকাশপাতাল তফাৎ। একটা উদাহরণ দিই । আপনি যদি আপনার সর্বস্ব একটিমাত্র সঞ্চয় সংস্থায় রাখেন কিম্বা তা দিয়ে কোন একটি কোম্পানির শেয়ার কেনেন, তাহলে আপনার সর্বস্বান্ত হবার যা সম্ভাবনা, আপনি নানা জায়গায় ছোট ছোট অঙ্কের বিনিয়োগ করলে, তার সম্ভাবনা অনেক কম। সমাজের দিক থেকে দেখলে, অনেক মানুষের হাতে অনেক ছোট বড় নানা সিদ্ধান্তের ক্ষমতা

যদি ছড়িয়ে দেওয়া থাকে তাতে বড় ভুল হবার যা সম্ভাবনা, যে কোন একজনের হাতে সব সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিলে তার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তাই সমস্যাটা প্ল্যানিং নিয়ে না, সমস্যাটা বিকেন্দ্রীকরণ নিয়ে। বাজার ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় গুণ হল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের বিকেন্দ্রীকরণ। অর্থনীতির জগতের বাইরে গেলে বাজারব্যবস্থা বাদ দিয়ে বিকেন্দ্রীকরণের আরও অনেক উদাহরণ আছে। গণতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিকের হাতে সরকার নির্বাচনের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূতভাবে দেওয়া আছে। সরকারের ক্ষেত্রে প্রশাসন, আইন প্রণয়ন এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, এগুলো সবই ক্ষমতার এবং সিদ্ধান্তের বিকেন্দ্রীকরণের উদাহরণ।

৭

তথ্যের অপ্রতুলতা, বা তথ্য ব্যবহারের জটিলতার প্রশ্নের কথা আপাতত বাদ দেওয়া যাক। ধরে নিই, সব তথ্য আমাদের ভাল একনায়কের পক্ষে আহরণ করা সম্ভব। তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব, ভবিষ্যতে কী হতে চলেছে। এবং তাঁর মধ্যে কোন মনস্তাত্ত্বিক ভ্রান্তির প্রবণতা নেই। কিন্তু তা হলেও কি তাঁর পক্ষে সফল হওয়া সম্ভব? এ হল পরিকল্পনা রূপায়ণের সমস্যা।

এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য ফের সুপারহিরোর শরণাপন্ন হওয়া যাক। সেই সিনেমার মূল সুর হল দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন। ধরা যাক, সুপারহিরো একাই দশ জনের সঙ্গে টক্কর নিতে পারে। সিনেমার পর্দায় শুধু মারামারিই দেখায়। আমাদের লেখায় সুপারহিরোর দৌড় আরও বেশি। আমরা ধরে নেব, যে কোনও ক্ষেত্রেই, দশ জন মিলে যে কাজ করতে পারে, তার জন্য সুপারহিরো একাই যথেষ্ট।

এ বার ভারতে আসুন। এ দেশে এখন লোকসংখ্যা, ধরে নিন, ১২০ কোটি। একটু কমিয়েই বললাম। ধরা যাক, যে কোনও মুহূর্তে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রতি এক লক্ষের মধ্যে একজন এমন সমস্যায় পড়েছেন যে সুপারহিরোকে দরকার। হয় তাঁদের পিছনে গুণ্ডা তাড়া করেছে, অথবা দাঙ্গা ফাসাদের মধ্যে পড়েছেন বা বাড়িতে আগুন লেগেছে এবং তাঁদের এমনই অবস্থা যে সুপারহিরো না বাঁচালে নিস্তার নেই। বস্তুত, আমরা এ রকম বেকায়দায় পড়ি বলেই তো সুপারহিরোর জন্য এমন ব্যাকুল হয়ে থাকি।

এ বার ভাবুন, দেশের প্রতি এক লক্ষে একজন মানুষ মানে সব মিলিয়ে বারো হাজার! মানে, সুপারহিরো একাই এক নিমেষে যেকোনো সমস্যার সমাধান করতে পারলেও কোন এক মুহূর্তে তাঁর এগারো হাজার নশো নিরানব্বই রেপ্লিকা চাই। অর্থাৎ, সুপারহিরোর অনুগত বাহিনী, যে বাহিনী সুপারহিরোর নির্দেশ মেনে চলবে অক্ষরে-অক্ষরে। তাদের শক্তি সুপারহিরোর সঙ্গে তুলনীয় হবে না, কারণ তা না হলে সুপারহিরো আর সুপার কিসের, কিন্তু সে কথা নয় বাদই দিলাম! মহাভারতে কথায় কথায় দু-এক অক্ষৌহিণী সেনা দেওয়া নেওয়া হত, কিন্তু মনে রাখতে হবে অর্জুন নারায়ণী সেনার আকর্ষণ ছেড়ে কৃষ্ণকেই সারথী হিসেবে চেয়েছিলেন। ধরে নেওয়া যেতে পারে হয় তখন কুরুক্ষেত্রের রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল (বিশেষত অন্য পথ ও রথচারীরা যখন নানা কায়দায় আপনাকে মারার চেষ্টা করছে, ঠিক ধর্মতলার

মোড়ের মত) তাই কৃষ্ণের মতো দক্ষ সারথীর খুবই প্রয়োজন ছিল, নয়তো এই সেনারা মহাভারতের সুপারহিরো কৃষ্ণের তুলনায় নেহাতই এলেবেলে ছিল।

সে যাই হোক, যাঁর ওপর সুপারহিরো কাজের দায়িত্ব চাপাবেন, তাঁর সেই দায়িত্ব সামলানোর এলেম আছে কি না– এই সমস্যাটা ভালো একনায়কের জন্যে যে অনেকের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা তার বাস্তব রূপায়নের সবচেয়ে বড় একটা চ্যালেঞ্জের একটা। অর্থনীতির পরিভাষায় একে প্রতিনিধিত্বের সমস্যা (problem of delegation or agency)। আপনি একটা কাজ করতে দিলেন আর এক জনকে, সে ফাঁকি দিতে পারে, চুরি করতে পারে, ঘুষ নিয়ে অথবা সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেমত কাজটা করতে পারে। এর মধ্যে যেটাই হোক না কেন, কোনওটাই আপনার মনঃপূত না হতে পারে। তাই হয় আপনাকে এ সব মেনে নিতে হবে, না হলে অন্য কাউকে লাগাতে হবে পাহারাদারি করার জন্যে। না হলে মেনে নিতে হবে আপনার হাতে নাই জগতের ভার, অর্থাৎ একা নায়ক হওয়া হল না আপনার। তাই তথ্য আহরণ ও বিশ্লেষণ করা যদি খুব সোজাও হত, অর্থাৎ আপনি সর্বদর্শী ও সর্বজ্ঞ হতেন, তবুও সর্বত্র বিরাজমান ও সর্বশক্তিমান না হলে সুপারহিরো হবার সুযোগ নেই।

৮

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার যে সমস্যাগুলো আলোচনা করলাম সেগুলো যে নেহাত মনগড়া বা তাত্ত্বিক সম্ভাবনা নয়, ঘোর বাস্তব, তার একটা বড় উদাহরণ হল চিনের ১৯৫৯-১৯৬১ সালের দুর্ভিক্ষ। মাও-পরবর্তী জমানায় মুক্তিপ্রাপ্ত সরকারি তথ্য অনুসারে এই দুর্ভিক্ষে অন্তত দেড় কোটি মানুষ মারা যান, মূলত গ্রামীন এলাকায়। অন্যান্য হিসেব অনুযায়ী এই দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা এর দুই বা তিন গুণ। যদি তুলনা করতে হয়, ১৯৪৩-এ বাংলায় যে মন্বন্তর হয়েছিল তাতে মৃতের সংখ্যা ত্রিশ লাখ। পৃথিবীর ইতিহাসে চিনের এই ঘটনার মত দুর্ভিক্ষে এত মানুষের প্রাণহানির আর উদাহরণ নেই। সম্প্রতি এক গবেষণাপত্রে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির জিন মেং, ইয়েল ইউনিভার্সিটির ন্যান্সি চিয়ান আর কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির পিয়ের য়্যারেড নানা সরকারি সূত্র থেকে আহৃত পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে এই দুর্ভিক্ষ বিষয়ে কিছু চমকপ্রদ তথ্য পেশ করেছেন। প্রথমত, যদিও ১৯৫৯ সালে উৎপাদন কিছুটা কম হয়, তাহলেও এই সময়ে গ্রামীন চিনে মোট খাদ্যশস্যের যোগান সমগ্র গ্রামীন জনসমষ্টির প্রাণধারণের জন্যে যে খাদ্যের চাহিদা তার প্রায় তিন গুন ছিল! দ্বিতীয়ত, অন্যান্য সময়ের তুলনায় ঠিক এই সময়েই বিভিন্ন রাজ্যে (province) এবং জেলায় (county) মৃত্যুর হারের মধ্যে ভিন্নতা (variation) অনেকটা বেড়ে গেছিল। অর্থাৎ, সাধারণ সময়ে একটা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মৃত্যুর হারের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য থাকেনা, তাই বিশেষ কোনও সময়ে সেটা হলে ধরে নিতে হবে যে যে অঞ্চলে মৃত্যুর হার বেড়েছে তার পেছনে অস্বাভাবিক কোন কারণ আছে। তৃতীয়ত, এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্য হল এই - এই সময়ে চিনের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যদি খাদ্যশস্য উৎপাদন এবং মৃত্যুর হারের মধ্যে পরিসংখ্যানগত পারস্পরিক সম্পর্ক গণনা করা হয়, তা হলে জানা যাচ্ছে তা হল উল্লেখযোগ্য ভাবে ধনাত্মক! একটু খটমট শুনতে লাগছে হয়তো

তাই আর একটু খোলসা করে বলি। যে যে অঞ্চলে জাতীয় গড়ের থেকে বেশি উৎপাদন হয়েছিল আমরা আশা করব সেখানে মৃত্যুর হার কম হবে। বাস্তবে হয়েছে ঠিক উল্টোটা । কেন তা বুঝতে গেলে চিনের পরিকল্পিত অর্থনীতিতে খাদ্যশস্য আহরণ নীতির বিশ্লেষণে ঢুকতে হবে।

দুর্ভিক্ষ যে আসলে খাবারের অভাবে হয় না, হয় বণ্টনের অসমতার জন্য, অমর্ত্য সেনের এই তত্ত্বটি উন্নয়নের অর্থনীতির দুনিয়ায় এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। চিনেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে ঘাটতি পড়েনি। তা হলে কী ঘটেছিল? সে কথা জানতে গেলে এক বার ১৯৫৯ সালের 'লাল চিন'-এর অবস্থা মনে করে নিতে হবে। সেখানে রাষ্ট্রই ঠিক করে দেয়, কোন অঞ্চল থেকে কত খাদ্যশস্য কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সংগৃহীত হবে, যা শহরের মানুষদের খাবার, রপ্তানি এবং বিপৎকালীন ভাঁড়ারে সংরক্ষণের জন্যে ব্যবহৃত হত। যা অবশিষ্ট থাকত তা গ্রামের মানুষদের খাবার জন্যে যৌথ রান্নাঘরে রান্না হত। হ্যাঁ, নিজে রেঁধে খাওয়ার অধিকার ছিল না কারও। নিজের উৎপাদিত শস্য রাখার অধিকারও ছিল না, কেনাবেচা তো দূরের কথা। শুধু তাই না, গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র যাবার অধিকার ছিলনা তাই গ্রামের যৌথ ভাঁড়ারে বন্টিত খাদ্য যদি যথেষ্ট না হত, তাহলে অনাহার অবধারিত ছিল। খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ, বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাপ্তির বরাদ্দ সবই ঠিক হয়ে আসত পার্টির সর্বোচ্চ স্তর থেকে। কাজেই, কোথায় কী সমস্যা হচ্ছে, সেই খবর পার্টির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছোতে এবং সেখান থেকে সমাধান তৈরি হয়ে সমস্যার জায়গায় ফিরে আসতে তথ্যের যাতায়াতে সময় লাগত অনেকটাই । এ দিকে, গত বছর দেশে কত শস্য উৎপন্ন হয়েছে, সেটা চলতি বছরের অগস্ট মাসের আগে ঠিক ভাবে জানার কোনও উপায় ছিল না। এই কেন্দ্রীয় শস্য-আহরণ নীতি তাই ভীষণই অনমনীয় ছিল, কোন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেবার প্রক্রিয়াটা ছিল খুবই মন্থর। এ বছরে কোন অঞ্চলের কতটা শস্য কেন্দ্রীয় সরকারকে খাজনা হিসেবে জমা দিতে হবে নির্ধারিত হত গত বছরের উৎপাদনের ওপর। এর ফলে যে অঞ্চলে উৎপাদন বেশি হয়, কোন কারণে সারা দেশে গড় উৎপাদন কম হলে, তাদের ওপর রাজস্বের ভার তুলনায় বেশি হবে এবং সেই কারণে খাদ্য শস্যের অভাব বেশি হবে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ধরা যাক দুটো অঞ্চল আছে যাদের জনসংখ্যা এক, কিন্তু উৎপাদনশীলতায় তফাৎ আছে । প্রথম অঞ্চলে উৎপাদন ১০০, আর দ্বিতীয় অঞ্চলে উৎপাদন ১৫০। এবার দুই জায়গাতেই উৎপাদন ২০% কম হল, অর্থাৎ আসলে উৎপাদন দাঁড়ালো ৮০ এবং ১১০। যেহেতু দুই জায়গায় জনসংখ্যা এক, সরকার দুই জায়গায় একই পরিমাণ খাদ্যশস্য স্থানীয় মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে রেখে দেবেন। ধরা যাক এই পরিমাণ হল ৫০। বাকিটা রাজস্ব হিসেবে দিতে হবে। কিন্তু এবার প্রথম অঞ্চলে রাজস্ব দিয়ে পড়ে থাকবে ৩০ আর দ্বিতীয় অঞ্চলে মাত্র ১০, প্রয়োজন যেখানে দুই জায়গাতেই অন্তত ৫০! তাই উৎপাদন বেশি হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি, ঠিক যা গবেষকেরা তাঁদের তথ্যবিশ্লেষণ থেকে দেখাচ্ছেন ।

অনমনীয় শস্য-আহরণ নীতিই একমাত্র সমস্যা ছিল না। শস্য উৎপাদন বিষয়ে আসল ছবিটা তুলে ধরার কাজটা কারও স্বার্থের সঙ্গেই খাপ খাচ্ছিল না। যাঁরা আঞ্চলিক স্তরের নেতা, চিনে কমিউনিস্ট পার্টির শাসন আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই তাঁরা সাধারণত নিজেদের অঞ্চলের খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণকে কমিয়ে রিপোর্ট করতেন, যাতে চাষিরা কিছু শস্য (রাষ্ট্রের ঘরে জমা না দিয়ে, অর্থাৎ এক রকম চুরি করেই) নিজেদের হাতে রাখতে পারে। এতে আঞ্চলিক নেতাদের

জনপ্রিয়তা বাড়ত নিশ্চয়ই। তবে, পার্টি সম্ভবত খুব খুশি হত না। ফলে, আঞ্চলিক নেতাদের ওপর মাঝেমধ্যেই উৎপাদন বাড়ানোর চাপ আসত। অথবা, তাঁদের মনে যখন উন্নতির বাসনা হত, তখনও তাঁরা নিজেরাই উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে দেখাতেন। অর্থাৎ, আঞ্চলিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরে উৎপাদন সংক্রান্ত যে খবর পৌঁছত, সেগুলো নির্ভরযোগ্য ছিল না মোটেই।

পার্টির সর্বোচ্চ স্তরের নেতারা জানতেন যে সব খবর বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু কোনটা কতখানি বিশ্বাস-অযোগ্য, বোঝার উপায় ছিল না তাঁদের। কিন্তু তাঁরা নিশ্চিত ভাবেই জানতেন, মাও বা তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা কম উৎপাদনের খবর পেতে পছন্দ করেন না। চিনে তখন ‘পরস্পরের দিকে সন্দেহের চোখে তাকানোর’ রাজনৈতিক সংস্কৃতি তুঙ্গে। ফলে, কম উৎপাদন বা খাদ্য সংকটের যে খবরই নীচু স্তর থেকে আসুক না কেন, সেই খবর ফিল্টার করে দেওয়া হত। ওপর মহলে খবর পৌঁছত, সব ঠিক আছে। নেতারাও বিশ্বাস করতে চাইতেন ‘সব ঠিক আছে’। ফলে, সব ঠিক থাকার খবরগুলোই তাঁরা গ্রাহ্য করতেন। ভুল থাকার খবর এলে সেটাকে নীচু স্তরের শয়তানি হিসেবেই দেখা হত।

এই প্রসঙ্গে অমর্ত্য সেনের বিখ্যাত বক্তব্য, যে গণতন্ত্রে দুর্ভিক্ষ হয়না মনে পড়ে যেতে বাধ্য। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার বিভিন্ন সমস্যা এবং অনমনীয় শস্য আহরণ নীতি সত্ত্বেও যদি চিনে রাজনৈতিক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হত, এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকতো তাহলে একবার যখন বোঝা যেত সমস্যাটা গুরুতর, আশা করা যায় জনমতের চাপে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হতেন। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দুই ব্যবস্থাতেই কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ একাধিপত্যের ফলেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটা সম্ভব হয় । বিংশ শতাব্দীতে যত মানুষ দুর্ভিক্ষে মারা গেছেন, তার ৬০% এই ধরণের পরিকল্পিত অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক একনায়কতন্ত্র যে দেশে সেখানে হয়েছে (চিনের এই দুর্ভিক্ষ বাদ দিলে, এর বড় উদাহরণ হল সোভিয়েত ইউনিয়নে ইউক্রেনে ১৯৩২-৩৩ সালে এবং উত্তর কোরিয়া তে ১৯৯২-৯৫ সালে হওয়া দুর্ভিক্ষ) ।

৯

এত ক্ষণ ধরে দেখলাম আমাদের একনায়কের সফল হওয়ার পথে বাধার সংখ্যা কতগুলো। এক বার ঝালিয়ে নেওয়া যাক। প্রথম সমস্যা, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যে স্বার্থের সংঘাতকে অতিক্রম করে “সমাজের কল্যাণ” বার করা। দ্বিতীয় সমস্যা, গোটা ব্যবস্থা চালাতে যে পরিমাণ তথ্য হাতে থাকা প্রয়োজন, সেটা জোগাড় করা অসম্ভব। তৃতীয় সমস্যা, কারও পক্ষেই, এমনকী নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীর পক্ষেও, ভবিষ্যৎ ঠিক কী হবে, তা অনুমান করা সম্ভব নয় এবং এই পরিস্থিতিতে ভুলভ্রান্তি হবার সম্ভাবনা খুব বেশি । চতুর্থ সমস্যা, সব তথ্য হাতে থাকলেও কার্যক্ষেত্রে সফল হওয়া অসম্ভব, কারণ একনায়কের নিজের পক্ষে সবটা করা সম্ভব নয়। তার অগণন বিশ্বস্ত অনুচর প্রয়োজন, বাস্তবে যা পাওয়া যায় না। তাই কেন্দ্রীয় কোন পরিকল্পকের হাতে সব সিদ্ধান্ত অর্পণ করলে তার ফলাফল ভয়ংকর হতে বাধ্য। এর উদাহরণ হিসেবে আমরা চিনের ১৯৫৯-৬১ সালের মহাদুর্ভিক্ষের কথা আলোচনা করেছি, যেখানে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সমস্যাগুলো একটা বড় ভূমিকা পালন করেছিল ।

শেষ বেলায় এসে একটা প্রশ্ন তোলা যাক। কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে রাজনৈতিক একনায়কতন্ত্রের যোগ কি থাকতেই হবে? এমন কি সম্ভব যে রাজনৈতিক পরিসরে গণতন্ত্র চলুক, কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের অধিকার থাক এক জনের হাতে? মুশকিল হল, কথাটা শুনতে যতখানি সহজ, কাজের ক্ষেত্রে ততটা নয়।

ধরে নেওয়া যাক প্ল্যানারের (ব্যক্তি, পার্টি বা গোষ্ঠী) উদ্দেশ্য সমাজের ভালো করা, এবং খুবই দক্ষতার সাথে তিনি পরিকল্পনা নির্মাণ ও রূপায়ণ করতে পারেন। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার যে মূল সমস্যা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, সেগুলো অনুপস্থিত। কিন্তু যদি কোন প্ল্যানারের হাতে সমস্ত তথ্য ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের অধিকার কেন্দ্রীভূত হয়, তাহলে এক জন সাধারণ মানুষের কি রাজনৈতিক স্বাধীনতা পড়ে রইল? আর কি নিশ্চয়তা আছে যে এত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে প্ল্যানার সব সময় সমাজের কিসে ভালো হয় সেই চিন্তাতেই নিত্য ব্যস্ত থাকবেন? যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ সে রকম হয়ে যাবে না তো? কোন নাগরিক যদি কোন ব্যাপারে তাঁর কথা না শোনেন বা প্রতিবাদ করতে যান, কেন্দ্রীয় প্ল্যানার অপ্রসন্ন হয়ে তাঁর কম্পিউটারে মারাত্মক কোন বোতাম টিপে দেবেন না তো? যতই হোক, তাঁর হাতে তো সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতার চাবিকাঠি। রাতারাতি চাকরি চলে গিয়ে, সমস্ত সঞ্চয় উধাও হয়ে গিয়ে, জমি-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়ে সুদূর কোন গুলাগে স্থান হবে না তো?

অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভুত হলে, রাজনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত হবার সম্ভাবনা কম। আবার এর উল্টোটাও সত্যি। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের রাশ যদি জনগণের হাতে থাকে, তবে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষমতাও আর একনায়কের হাতে থাকতে পারে না। কারণ, রাজনৈতিক পরিসরে প্রতিটি অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য জবাবদিহির প্রয়োজন পড়বে। এই রাজনৈতিক পরিসর থেকেই এমন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের দাবি উঠবে, যা একনায়কের সিদ্ধান্তের সঙ্গে খাপ খাবে না। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় প্ল্যানারের কম্পিউটারে সব তথ্য থাকলেও, সিদ্ধান্ত নেবার পথে পদে পদে বাধা আসবে এবং ইচ্ছে হলেও প্রতিবাদী কোন নাগরিককে ইহলোক বা পরলোকে নির্বাসনে পাঠানো যাবেনা। ফলে, রাজনীতি আর অর্থনীতির সংঘাত নিয়ত চলতে থাকবে। হয় অর্থনৈতিক একনায়কতন্ত্রের অবসান হবে, অথবা রাজনৈতিক গণতন্ত্রের। গোটা দুনিয়ার ইতিহাস বলছে, অর্থনৈতিক একনায়কতন্ত্র রাজনৈতিক ক্ষমতাও কুক্ষিগত করতে চেয়েছে এই সংঘাত এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই।

অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভুত হলে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবার সম্ভাবনা প্রবল হলেও, অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভুত হলেই তার সাথে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত হবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই। রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে বিসর্জন দেওয়ার ফল যে সবার জন্যে সব সময় সব দিক থেকে মন্দ হবে, বাস্তবে এমন দাবি করার কোনও উপায় নেই, আগেই এই আলোচনা করেছি। চিন-সহ পূর্ব এশিয়ায় জ্বলজ্বল করছে সব উদাহরণ, যেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতাহীনতা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ একই সঙ্গে রয়েছে। সেখানকার সব মানুষ রাজনৈতিক স্বাধীনতার অভাবে খুব দুঃখে রয়েছেন, এমন অনুমানেরও কোনও জায়গা নেই। কিন্তু, সিঙ্গাপুরকে মনে রাখতে হলে পাশাপাশি উত্তর কোরিয়াকেও মনে রাখা ভাল। সে দেশের কমিউনিস্ট শাসকদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রশ্নাতীত। অর্থাৎ,

কেউ সে বিষয়ে প্রশ্ন তুললে তার অতীত হয়ে যেতে খুব বেশি সময় লাগে না! সেই দেশের 'প্রিয় নেতা' কিম জং-ইল গত শতকের নব্বইয়ের দশকে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে সিদ্ধান্ত করেছিলেন, পাহাড়ের সব গাছ কেটে সেখানে ধান চাষ হোক। 'ডিয়ার লিডার'-এর প্রস্তাবের বিরোধিতার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। পাহাড় সাফ করে চাষ হয়েছিল। তার পর এল বর্ষা। এত দিন পাহাড়ের গাছে জল আটকাত, মাটির গভীরে যেত। কিন্তু সেই পাহাড়ি গাছ তো আর নেই। ফলে, বৃষ্টির জল নেমে এল তুমুল বন্যা হয়ে। নষ্ট হয়ে গেল সব ফসল। দেশে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ হল। যে দেশের মোট অধিবাসীর সংখ্যা তখন দু'কোটির কাছাকাছি ছিল, সেখানে এই দুর্ভিক্ষে মারা গেলেন প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষ।

গণতন্ত্র হল ওই পাহাড়ি গাছগুলোর মতো। অনেক বন্যা তাতে আটকে যায়। অন্তত, বন্যার তীব্রতা কমে। তার মানে এই নয় যে গণতন্ত্র থাকলে, বাজার ব্যবস্থা চালু থাকলে দুর্ভিক্ষ হতে পারে না। অবশ্যই পারে। এটা ঠিকই বাজারে চাহিদা ও যোগানের যেখানেই অসাম্য সেখানেই দামের ওঠাপড়ার ফলে অবস্থার খানিকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ হবে। যেখানে চাহিদা যোগানের থেকে অনেক বেশি, সেখানে বেশি দাম বাড়বে, এবং তার ফলে অন্য অঞ্চল থেকে শস্য সেই অঞ্চলের বাজারে এসে পড়বে। কিন্তু যারা খুব দরিদ্র তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা যেহেতু সীমিত, মূল্যবৃদ্ধির ফলে তাঁরা অনাহারের মুখোমুখি হবেন। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরে ঔপনিবেশিক সরকারের উদাসীনতা বড় ভূমিকা পালন করেছিল ঠিকই। কিন্তু একথাও সত্যি যে চিনের দুর্ভিক্ষের মত, মোট উৎপাদন মোট চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত ছিল । শস্য ব্যবসায়ীরা আরও দাম বাড়বে এবং তাতে প্রচুর লাভ হবে এই আশায় শস্য মজুত করে রেখেছিলেন। কিন্তু, গণতন্ত্র থাকলে, বহু স্বরের স্বাধীনতা থাকলে সেই দুর্ভিক্ষ এমন সর্বগ্রাসী হতে পারে না। বিভিন্ন মহল থেকে সরকারের ওপর চাপ তৈরি হবে, রাজনৈতিক কারণেই সেই চাপ অস্বীকার করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে না। একনায়কতন্ত্রে যেমন শাসক ইচ্ছে করলে দুর্ভিক্ষের কথা একেবারে স্বীকারই না করতে পারে, গণতন্ত্রে সেটা অসম্ভব। এবং, এক বার সমস্যাকে স্বীকার করে নিলে তার সমাধানসূত্র খোঁজা ছাড়া আর কোনও উপায় সরকারের সামনে থাকে না। অমর্ত্য সেনের মতে, দুর্ভিক্ষের কারণ যাই হোকনা কেন, তার মোকাবিলা করতে গেলে সরকারি বণ্টন ব্যবস্থাকে সক্রিয় হতে হবে । স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতে শস্যের উৎপাদনের ওঠাপড়া যাই হোক না কেন, বড় কোনও দুর্ভিক্ষ হয়নি এবং এর পেছনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভূমিকা অস্বীকার করা মুশকিল।

শুধু দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্রেই নয়, কথাটা যে কোনও বিপর্যয়ের ক্ষেত্রেই সমান সত্য। যত ক্ষণ সব কিছু ঠিক ভাবে চলে, তত ক্ষণ রাজনৈতিক ক্ষমতার অভাব মানুষ হয়তো টেরও পায় না। কিন্তু, একনায়ক ভুল পথে চালিত হলে তখন আর উপায় থাকে না। অর্থনৈতিক একনায়কতন্ত্রের মূল বিপদ এখানেই। তা রাজনৈতিক একনায়কতন্ত্র ছাড়া বাঁচতে পারে না। এবং, রাজনৈতিক একনায়কতন্ত্র বড় বিপজ্জনক পথ। পা ফসকালে আর ফেরার উপায় নেই। কোন ভালো একনায়ক বা নেতা এসে "সব ঠিক করে দেবেন", বা "বিপ্লব হলে সব ঠিক হয়ে যাবে" এইধরণের কল্পনাবিলাসের ফোকর দিয়ে ঢুকে পড়ে সত্যিকারের একনায়কতন্ত্র । তার দীর্ঘমেয়াদি ফল কোন দেশে কোন কালে ভালো হয়নি। এই কারণেই গণতন্ত্র জরুরি। গণতন্ত্রের মূল কথা হল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ । ক্ষমতার একটি বড় উৎসকে ভেঙে তা অনেকগুলো ছোট ছোট

মুখ তৈরি করে দেয়। এই বিকেন্দ্রিত পরিসরে একটা টানাপোড়েন চলতেই থাকে। ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সেই টানাপোড়েনের কোনও বিকল্প নেই।

এই লেখার মূল উদ্দেশ্য ছিল সেই বিকেন্দ্রিত পরিসরের মাহাত্ম্যটি এক বার ফের স্মরণ করিয়ে দেওয়া। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে তার কী বিপদ, সে কথা আরও এক বার আলোচনা করে নেওয়া। গণতন্ত্রের এই বিকেন্দ্রিত চরিত্রটি বাজারের মধ্যে যত দূর প্রতিফলিত হয়, তত দূর অবধি বাজার কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার তুলনায় বিপর্যয়ের প্রতিষেধক। কিন্তু তার মানে এই নয় বাজারব্যবস্থার কোন সমস্যা নেই। নৈতিক দিক থেকে তো বাজার ব্যবস্থার সমর্থনে বেশি কিছু বলার কোন জায়গাই নেই ।[vi] বাজারের দর্শনই হল ফেল কড়ি মাখো তেল, তাই সমাজের দরিদ্রতম শ্রেণীর প্রতি বাজারের উদাসীনতা সামাজিক কল্যাণের দিক থেকে দেখলে একেবারেই অন্যায্য । সামাজিক এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছাড়া বাজারব্যবস্থায় মাৎস্যন্যায় হবার সম্ভাবনা পুরোপুরি বিরাজমান। টাকার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দিয়ে যখন সম্পদের বণ্টন হয়, তার মধ্যে নিহিত আছে হাজারো সামাজিক অন্যায়ের সম্ভাবনা এবং তার বাস্তব রূপ আমরা প্রত্যহ চারপাশে দেখতে পাই, সে শিশু শ্রমই হোক আর শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সম্পর্কে নির্লিপ্ত মনোভাব হোক (বাংলাদেশে সম্প্রতি একটি কারখানা ভেঙে পড়ে বহু শ্রমিকের মৃত্যু মনে পড়ে যেতে বাধ্য) । শুধু তাই না বাজার ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে স্বেচ্ছা-বিনিময়ের আদর্শের ওপর, অথচ এর বাস্তব প্রয়োগে অনেক সময়েই যে নীতি ব্যবহৃত হয়, তা হোল জোর যার মুলুক তার । যেমন, জমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যক্তিগত বা যৌথ মালিকানার অধিকার অনেকসময়েই লঙ্ঘিত হয় জাতীয় ও বহুজাতিক বড় বড় কর্পোরেশনের সাথে রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্রব্যবস্থার আঁতাতে । শুধু তাই নয়, বাজারব্যবস্থার মধ্যেও একনায়ক গড়ে ওঠার প্রবণতা থাকতে পারে। তখন বাজার তার বিকেন্দ্রিত, প্রতিযোগিতাভিত্তিক চরিত্রটি হারায়।[vii] একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত হলে যে তার ফল বিষময় হয় তার উদাহরণ হিসেবে “বানানা রিপাবলিক” কথাটা মনে পড়ে যেতে বাধ্য । কয়েক দশক আগে অবধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ আমেরিকার নানা দেশে (যেমন, হন্ডুরাস, গুয়াতেমালা) বিদেশনীতির একটা বড় অঙ্গ ছিল বড় বড় কর্পোরেশনের (যারা অনেকেই ফল রপ্তানির ব্যবসায়ে যুক্ত ছিল, তাই কলার উল্লেখ) পৃষ্ঠপোষক একনায়কদের অন্ধ সমর্থন । সেই বাজারও খুব বিপজ্জনক। আমাদের দেশে পুঁজিবাদী শ্রেণী ও রাষ্ট্রব্যবস্থার একটা অংশের আঁতাতে প্রতিনিয়ত দরিদ্র মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, পরিবেশ বিপন্ন হচ্ছে, চলছে উচ্ছেদ এবং লুঠ । এর প্রতিবাদ করা যেকোন প্রগতিশীল নাগরিকের কর্তব্য। কিন্তু নয়া-উদারবাদের প্রতিবাদ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আদি-সনাতনবাদের প্রতি নস্টালজিয়া পরিহার্য । এই প্রবন্ধে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার নানা সমস্যার ওপর জোর দিলেও, আমাদের মূল বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা আরও সুদূরপ্রসারী । একনায়কতন্ত্রের সম্ভাবনার প্রতিরোধের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ । এর জন্যে প্রয়োজন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক পরিসরে গণতন্ত্রের বিকেন্দ্রিত চরিত্রটির বিকাশের প্রক্রিয়াকে জোরদার করা। এটাই হল এই সময়ের প্রগতিশীল পথের দাবি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : এই লেখার বিষয়বস্তু নিয়ে টিম বেসলি, প্রণব বর্ধন, মৃণাল দত্তচৌধুরী, শিশির দেবনাথ, এবং মনীষিতা দাশের সঙ্গে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। মনীষিতা দাশ এবং শ্রেয়সী দস্তিদার লেখাটা পড়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এঁদের সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

সূত্র

Baqir, R. [2002]: "Social Sector Spending in a Panel of Countries", IMF Working Paper 02-35.

Basu, K. [2011]: Beyond the Invisible Hand: Groundwork for a New Economics, Penguin.

Cao G., C. Feng and R. Tao [2008]: "Local Land Finance in China's Urban Expansion: Challenges and Solutions", China and World Economy, 16(2), 19-30.

Hayek, F. A. [1945] : "The Use of Knowledge in Society," The American Economic Review, No.4, Vol. XXXV, 519-30.

Kahneman, Daniel [2011]: Thinking, Fast and Slow, London: Allen Lane.

Meng, X., N. Qiyan, and P. Yared [2013]: "The Institutional Causes of Famine in China, 1959-61," NBER Working Paper w16361.

Sen, Amartya [1981]: Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford, Clarendon Press.

Taleb , Nassim Nicholas [2007]: The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. New York: Random House and Penguin.

---

[i] এই বিষয়ে কাও, ফেং এবং টাও-এর ২০০৮ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ।

[ii] যদি ভাবেন গণতন্ত্রেও এরকম হতে পারে, যেমন নন্দীগ্রাম, তাহলে দুটো কথা বলার আছে। চিনে জমি অধিগ্রহণ এবং তার জন্যে দমন-পীড়নের যে মাত্রা, তার সাথে এর কোন তুলনা হয়না, এবং পশ্চিমবঙ্গে যে সরকারের আমলে এই ঘটনা ঘটে, তা এরই জেরে নির্বাচনে পরাজিত হয় ।

[iii] রেজা বকিরের ২০০২ সালের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

[iv] একটা উদাহরণ দিই। ধরুন তিনটে সম্ভাবনা আছে ক, খ, এবং গ আর তিনজন নাগরিক আছেন, ১,২ ও ৩। এই তিনটে সম্ভাবনার মধ্যে ১-এর পছন্দের তালিকা হল ক, খ, গ; ২-এর তালিকা খ, গ, ক এবং ৩-এর তালিকা হল গ,ক, খ। সমাজের পছন্দের তালিকা কি হবে? ধরা যাক সেটা ক হবে। কিন্তু, অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ নাগরিক (অর্থাৎ, ২ এবং ৩) ক-এর থেকে গ-কে বেশি পছন্দ করেন! তাই স্যোশাল প্ল্যানারের পক্ষে ক-কে বেছে নেওয়া মুশকিল। কিন্তু সমস্যা হল, খ বা গ অন্য যে সম্ভাবনাই বেছে নেওয়া হোকনা কেন, একই যুক্তি খাটে তার বিরুদ্ধে! তাই হয় একজনের ক্ষমতা থাকবে তার পছন্দ বাকিদের ওপর চাপিয়ে দিতে, তা না হলে অনন্তকাল ধরে তর্ক চলবে।

[v] এই প্রসঙ্গে প্রথম লেখকের "কোথায় পাব তারে - অন্য অর্থ, অন্য নীতির সন্ধানে" (অনুষ্টুপ, শারদীয় সংখ্যা, ২০১১) লেখাটি দ্রষ্টব্য।

[vi] এই নিয়ে প্রথম লেখকের “অনর্থনীতি : অর্থনীতি কারে কয়, সে কি কেবলই যাতনাময়” (অনুষ্টুপ, শারদীয় সংখ্যা ২০১২) প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা আছে।

[vii] এই প্রসঙ্গে কৌশিক বসুর ‘বিয়ন্ড দি ইনভিজিবল হ্যান্ড: গ্রাউন্ডওয়ার্ক ফর আ নিউ ইকনমিকস’ , পেঙ্গুইন, ২০১১, বইটি দেখা যেতে পারে।